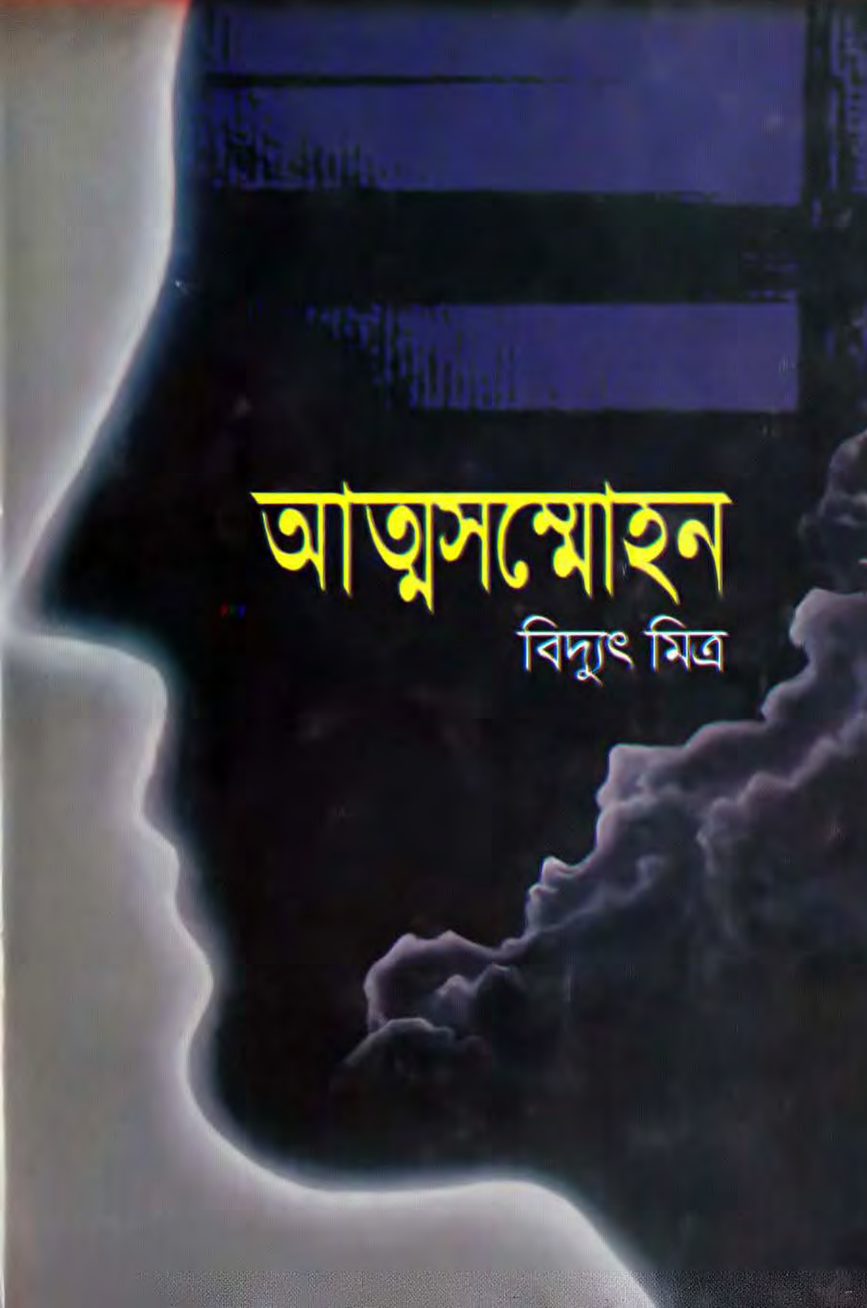


আত্মসম্মোহন

বিদ্যুৎ মিত্র

আত্মসম্মোহন

বিদ্যুৎ মিত্র

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ
সেবা প্রকাশনী ১৯৭৮
প্রজাপতি সংস্করণ ১৯৯৫
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
আলীম আজিজ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩৪১৮৪
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ISBN-984-462-913-6
Atmo Shammohan (Self-Hypnosis)
By: Bidyut Mitra
মূল্য ॥ বিয়াল্লিশ টাকা

সুপ্রিয়
আহমেদ নূরে আলমকে

সূচি

ভূমিকা

প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী আপনার ভেতরের অবচেতন মন। অবিশ্বাস্য বা আপাতদৃষ্টিতে 'অসম্ভব কিছু'কে অতি সহজে সম্ভব করে তোলার শক্তি রয়েছে আপনার নিজেরই মধ্যে। পারবেন, যদি পৌঁছতে পারেন সেই মনের দুয়ারে।

ধরা ছোঁয়ার বাইরের জিনিস এই অবচেতন মনের সাথে যোগাযোগের সহজতম উপায় হচ্ছে আত্মসম্মোহন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসী, দরবেশ ও যোগ-সাধকদের বিস্ময়কর কীর্তিকলাপের পেছনেও কাজ করছে আসলে আত্মসম্মোহনই। অবচেতন মনের ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে তাঁরা সম্ভব করছেন অসম্ভবকে।

এই গ্রন্থে আত্মসম্মোহন শিক্ষার সহজ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আপনি কি কি উপকার পেতে পারেন সে বিষয়েও সুস্পষ্ট পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

আশা করি বিদ্যাটি শিখে নিয়ে বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে আপনি নানাভাবে উপকৃত হতে পারবেন, পৌঁছে যেতে পারবেন উন্নতির শিখরে।

বিদ্যুৎ মিত্র

বি : দ্র :—এই গ্রন্থে আমার লেখা 'ধূমপান ত্যাগে আত্মসম্মোহনে'র কিছু কিছু অংশ ও রহস্যপত্রিকায় প্রকাশিত 'আত্মসম্মোহন' শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হওয়ায় যুক্ত করা হলো। —বি. মিত্র।

প্রাসঙ্গিক কথা

সম্মোহন বা হিপনোটিজমের নাম আমরা সবাই শুনেছি। বিভিন্ন বই-পুস্তক, সিনেমা-টিভি দেখে এ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণাও আমাদের আছে। কাজেই বিস্তারিত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

একজন সম্মোহনকারী (Hypnotist) যখন অপর কাউকে সম্মোহন করেন, তখন সেটাকে বলা হয় hetero hypnosis, বা পর-সম্মোহন। কিন্তু সম্মোহনকারী যখন নিজেই নিজেকে সম্মোহন করেন, তখন তাকে বলা হয় auto বা self hypnosis, বা আত্মসম্মোহন।

আত্মসম্মোহন হচ্ছে, সংক্ষেপে বলতে গেলে, এমন একটা বিদ্যা যার মাধ্যমে আপনি আপনার মহাশক্তিশালী অবচেতন মনকে নিজের ইচ্ছেমত বিভিন্ন কাজে লাগাতে পারেন। চেতন ও অবচেতন মনের যোগ-সাধন করা এবং চেতন মনের আদেশ বা নির্দেশ অবচেতন মনে পৌঁছে দেয়ার সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে আত্মসম্মোহন। এর তিনটি স্তর আছে: হালকা বা lethargic স্তর, মাঝারি বা cataleptic স্তর ও গভীর বা somnambulistic স্তর।

স্বাভাবিকভাবেই আপনি জানতে চাইবেন, এই বিদ্যা শিখে আপনার কি কি লাভ হবে, এর প্রয়োগে কোনরকম ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কিনা, এ বিদ্যা অর্জন করার ক্ষমতা আপনার আছে কিনা এবং থাকলে কতদিনে তা সম্ভব।

প্রথমে লাভের কথাই ধরা যাক। লাভ অপরিসীম। কতটা, তা এখনও সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। অতি প্রাচীন বিদ্যা হলেও একে বহুদিন মানুষ অবহেলা বা ভয়ের চোখে দেখে এসেছে। একে বাস্তব কাজে লাগাবার জন্যে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে মাত্র অল্পদিন যাবত। বর্তমানে হাজার হাজার গবেষক কাজ করছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর বহুমুখী ফলপ্রদ প্রয়োগ আবিষ্কারের জন্যে। এখন পর্যন্ত এর উপকারিতা সম্পর্কে আমরা যা জানি তা হলো হালকা বা মাঝারি স্তরে পৌঁছুতে পারলেই এই বিদ্যা প্রয়োগ করে আপনি গভীর উদ্বেগ, উত্তেজনা

ও দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন, অতিরিক্ত লজ্জা ও মঞ্চভীতি দূর করতে পারেন, অমূলক ভয়, যৌন অনীহা বা অক্ষমতা ও হতাশাজনিত সমস্যা সমাধান করতে পারেন; আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয়, উদ্যম ও উৎসাহ অর্জন করতে পারেন, লক্ষ্যস্থির করে নিয়ে নিশ্চিত পদক্ষেপে নিজ লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেন, অতিরিক্ত ধূমপান, মদ্যপান ও অতিভোজনের অভ্যাস দূর করতে পারেন, হীনতা বোধ ও গড়িমসির প্রবণতা দূর করে প্রাণবন্ত সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেন, পরিপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন, অনিদ্রা দূর করতে পারেন, তোতলামি বা নখ কামড়ানোর অভ্যাস দূর করতে পারেন, একাগ্রচিত্ততা ও স্মরণশক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করতে পারেন, সৃজনশীল চিন্তা ও কাজে উন্নততর মান অর্জন করতে পারেন, শৈল্পিক প্রকাশ ভঙ্গির উন্নতি সাধন করতে পারেন।

গভীর বা সোমনামবিউলিস্টিক স্তরে পৌঁছুতে পারলে প্রচণ্ড দাঁতের ব্যথা, অস্ত্রোপচারের বেদনা, এমন কি গর্ভযাতনা থেকেও নিষ্কৃতি পেতে পারেন, আতঙ্কের হাত থেকে বাঁচতে পারেন, এবং নিজের গভীরতম মানসিক সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

তবে জেনে রাখা ভাল, যে কোন গুরুতর মানসিক সমস্যার জন্যে অবশ্যই সাইকোথেরাপির সাহায্য গ্রহণ করা দরকার। আপনি নিজে-নিজেই আপনার সব রকমের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবেন, এমন অন্যায় দাবি আমরা করব না। উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য সব সময়েই সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে বা টাকার অভাবে আপনি শুধু শুধু কষ্ট ভোগ না করে এই বিদ্যা প্রয়োগ করে অনেকটা উপকৃত হবেন, এটুকু জোর গলায় বলা যায়।

চিকিৎসক বা টাকার অভাব না থাকলেও আপনি আত্মসম্মোহন শিখে উপকৃত হতে পারেন। এর ফলে চিকিৎসা অত্যন্ত ত্বরান্বিত হবে, আপনার এক কথায় চিকিৎসক অনেক কিছু বুঝে নিতে পারবেন।

এবার আসা যাক ক্ষতির প্রশ্নে।

ক্ষতির ভয় নেই। অনেক উপন্যাস, সিনেমা ও টিভিতে সম্মোহন সম্বন্ধে যে গাঁজাখুরি ধারণা দেয়া হয়, সেগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারও দ্বারা সম্মোহিত হলেই তার বশীভূত হয়ে যাবেন, বা তার ইচ্ছেয় আপনাকে চলতেই হবে, অথবা আপনি দুর্বল চরিত্রের লোক বলে প্রমাণিত হবেন, এসব সম্পূর্ণ ভুল ও অবৈজ্ঞানিক ধারণা। এটা conditioned response মাত্র। আতঙ্ক বোধ করার মত কিছুই নেই এতে।

মনে রাখা দরকার, যে-কোন সম্মোহনই আসলে আত্মসম্মোহন, আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কারও সাধ্য নেই আপনাকে সম্মোহিত করে। সবার মধ্যেই প্রকৃতিদত্ত আত্মরক্ষার তাগিদ ও ক্ষমতা আছে, সম্মোহিত অবস্থায় আপনার নিজের পক্ষে ক্ষতিকর কোন নির্দেশ পেলেও আপনি তা পালন করতে বাধ্য নন। এমন কি, ইচ্ছে করলেই আপনি তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে যে-কোন মুহূর্তে বাস্তব জগতে ফিরে আসতে পারেন। শীতের রাত, জানালাটা খোলা, ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, জানালাটা বন্ধ করা দরকার, কিন্তু গরম বিছানা আর লেপ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না—সম্মোহিত অবস্থা অনেকটা এই রকম। কিন্তু সেই জানালায় যদি একটা চোরের ছায়া দেখেন, তড়াক করে লাফিয়ে উঠবেন, মুহূর্তে ছুটে যাবে আপনার মোহাচ্ছন্ন ভাবটা—ঠিক এমনিভাবেই জেগে উঠবেন আপনি সম্মোহিত অবস্থা থেকে বিপদ দেখলে।

আত্মসম্মোহনে আপনার ভয়ের কিছুই নেই, নেই কোন রকম ক্ষতির সম্ভাবনা। সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রেইড, মেসমার থেকে নিয়ে এসডেইল, ইলিয়টসন, ব্রামওয়েল এবং আধুনিক যুগের লেক্রন, উলবার্গ, এরিকসন প্রভৃতি বহু পণ্ডিত ব্যক্তি হাজার হাজার মানুষের উপর সম্মোহন বিদ্যা প্রয়োগ করেছেন, অসংখ্য রোগী রোগমুক্ত হয়েছেন এর সাহায্যে এবং আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ নিয়মিত আত্মসম্মোহন অভ্যাস করছেন—এখন পর্যন্ত একটিও দুর্ঘটনার বাস্তবভিত্তিক খবর পাওয়া যায়নি।

এবার দেখা যাক, এ বিদ্যা অর্জন করার ক্ষমতা আপনার আছে কিনা। তার আগে জবাব দিন, কিছু দেখে বা শুনে প্রভাবিত হওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা আপনার। নিঃসন্দেহে এটা একটা বাজে প্রশ্ন। আমরা সবাই জানি, পৃথিবীতে কেউই প্রভাবমুক্ত নয়। প্রতিদিন অসংখ্য ব্যাপারে প্রভাবিত হচ্ছি আমরা। এবং যারই প্রভাবিত হওয়ার ক্ষমতা আছে, তার আত্মসম্মোহন বিদ্যা অর্জন করারও ক্ষমতা আছে।

সত্যি কথা বলতে গেলে, আত্মসম্মোহন শিখতে পারবে না এমন মানুষ কোটিতে গুটিক। সবাই শিখতে পারবে, মানসিক গঠনের বিভিন্নতার জন্যে কারও সময় বেশি লাগবে, কেউ অল্প সময়ে শিখে ফেলবে। তফাৎ শুধু সময়ের।

এবার শেষ প্রশ্নটি, অর্থাৎ আত্মসম্মোহন শিখতে কত সময় প্রয়োজন। এ ব্যাপারে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার আগ্রহ, উদ্যম ও মানসিকতার উপর। সাধারণ অবস্থায় প্রতিদিন

বিশ থেকে ত্রিশ মিনিট অভ্যাস করলে আট থেকে ষোলো সপ্তাহের মধ্যেই বিদ্যাটি আপনার মোটামুটি আয়ত্তে চলে আসা উচিত। তবে সময় নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানো ঠিক নয়, কারণ এই অত্যাশ্চর্য বিদ্যা একবার আয়ত্ত করতে পারলে সারা জীবন ব্যবহার করতে পারছেন আপনি আপনার আত্মোন্নতির বিভিন্নমুখী কাজে। সময় বেশি নাহয় লাগলই। বাকি জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির বিনিময়ে যদি এক বছরও লাগে, সে-ও তো সামান্য সময়।

অবচেতন মন

প্রায় সবাই জানে ভিতরের মন বলে একটা জিনিস রয়েছে সবার মধ্যে, নানান জনে নানান নামে ডাকে এটাকে—অবচেতন, অচেতন, সাবজেকটিভ, সাবলিমিনাল, ইড—কত কি। আমরা এটাকে অবচেতন মন বলব। দার্শনিক বাক-বিতণ্ডা এড়িয়ে যত শীগগির সম্ভব ঢুকে পড়ব আমরা কাজের কথায়।

সম্মোহনকে বুঝতে হলে অবচেতন মন সম্পর্কে কিছুটা জেনে রাখা দরকার। দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত খুব বেশি কিছু জানা যায়নি এর সম্পর্কে। এর গতি-প্রকৃতি আজও রহস্যাবৃত। শুধু জানা গেছে এই মনটা আমাদের প্রেরণা, আবেগ ও প্রবৃত্তিকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করছে। আরও জানা গেছে, এর সাথে যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হচ্ছে সম্মোহন।

অবচেতন মনের একটা কাজ হচ্ছে শরীরের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং গ্ল্যাণ্ডের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

সম্মোহিত অবস্থায় সাজেশন দিয়ে রক্ত চলাচল, হার্টবিট ও শরীরের তাপ বাড়ানো বা কমানো যায় খুব সহজে, জখম সারিয়ে তোলা যায় খুব দ্রুত, গ্ল্যাণ্ডগুলোর কাজের ধারা পরিবর্তন করা যায়। রাশিয়ান মনস্তত্ত্ববিদ কে. প্ল্যাটোনভের 'সাইকোলজি অ্যায উই মে লাইক ইট' বইয়ের পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় একটা হাতের ফটোগ্রাফ রয়েছে—হাতের উপর একটা ফোস্কা।

সম্মোহিত অবস্থায় এই হাতের উপর একটা ধাতুর মুদ্রা ঠেসে ধরে শুধু বলা হয়েছিল ওটা প্রচণ্ড গরম, সাথে সাথেই ফোস্কা উঠে গেল জায়গাটায়।

অবচেতন মনের গতি-প্রকৃতি চেতন মন থেকে আলাদা। এর কাজ কারবার সোজাসাপটা, মারপ্যাঁচের ধার ধারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর মত—যা বলা হচ্ছে তাই বুঝবে, অন্তর্নিহিত মানে খুঁজবে না। সচেতনভাবে আমরা অনেক সময় এক কথা বলে আরেক কথা বোঝাই, এর কাছে ওসব চলবে না।

সম্মোহিত অবস্থায় অবচেতন মনটা নাগালের মধ্যে আসে। সচেতন কোন লোককে যদি জিজ্ঞেস করেন, 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনি কোন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছেন বলবেন?'—তাহলে উত্তরে স্কুলের নামটা বলবেন ভদ্রলোক। এটাই স্বাভাবিক। তিনি ধরে নিচ্ছেন আপনি স্কুলের নামটা জানতে চাইছেন। কিন্তু গভীর ভাবে সম্মোহিত কোন লোককে যদি এই প্রশ্ন করেন, উত্তর আসবে—'হ্যাঁ' কিংবা 'বলব'। এটাই যথার্থ উত্তর। তিনি রাজি আছেন স্কুলের নামটা বলতে। যা বলছেন, ঠিক তাই বুঝছে অবচেতন মন, ব্যাখ্যা করছে না।

আমরা বড় হওয়ার সাথে সাথে অনেক বিষয় সম্বন্ধে সচেতন ভাবে ধারণা পাল্টাই। অবচেতন মনেরও তেমনি পরিবর্তন হয়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটা শৈশবের ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে ধরে রাখে। শৈশবে বড় কোন ঘটনা ঘটে থাকলে সেই ঘটনাটাকে আপনার অবচেতন মন শৈশবের দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখবে। ছোটবেলায় আরশোলা, মাকড়সা, ব্যাঙ বা টিকটিকি দেখে ভয় পেয়ে থাকলে সেই ভয়টা বড় হয়েও রয়ে যায়। চেতন মন বুঝতে পারছে ওগুলো ভয়ানক কিছু নয়, কিন্তু তবু আতঙ্কিত হচ্ছে মানুষ, অবচেতন মনে শৈশবের দৃষ্টিভঙ্গিটাই রয়ে গেছে বলে।

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, চেতন মন অনেক কিছু ভুলে যায়, কিন্তু অবচেতন মন ভোলে না কিছুই। বিভিন্ন ব্যাপারে এমন অনেক ঘটনা, স্মৃতি রয়েছে যা আপনার চেতন মন ভুলে গেছে। কিন্তু সেসব ঠিকই জমা হয়ে আছে আপনার অবচেতন মনে। হয়তো আঙুল চোষার বিকল্প হিসেবে আপনি সিগারেট টেনে চলেছেন।

অবচেতন মনের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে আপনাকে রক্ষা করা। সদা সতর্ক রয়েছে এটা, আপনি জেগে থাকুন বা ঘুমিয়ে থাকুন বা অজ্ঞান অবস্থায় থাকুন বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে যাচ্ছে আপনার

অবচেতন মন, সজাগ রয়েছে বিপদ-আপদের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করার জন্যে।

এই সোজা সরল অবচেতন মনের সাহায্য নিতে পারলে নিজের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে মনের মত করে গড়ে তুলতে পারবেন নিজেকে। আগেই বলেছি, অবচেতন মনের সাথে যোগাযোগ করতে হলে সম্মোহনের সাহায্য খুব কাজে লাগবে আপনার। সেটা হিটারো-হিপনোসিস বা অপর কারও সাহায্যে সম্মোহিত হলেও হতে পারে, সেলফ্-হিপনোসিস বা আত্মসম্মোহনের দ্বারাও হতে পারে।

সম্মোহিত হওয়ার যোগ্যতা

সবাই সম্মোহিত হতে পারে না। শতকরা পাঁচজন মানুষ হাজার চেষ্টা করেও সম্মোহিত হতে পারবে না। কিন্তু বাকি পঁচানব্বই জন সহজেই হালকা, মাঝারি বা গভীর স্তরে পৌঁছে যেতে পারে সামান্য চেষ্টাতেই।

কিন্তু একটা হাস্যকর ব্যাপার হলো, প্রায় সবারই ধারণা তার বুঝি সম্মোহিত হওয়ার যোগ্যতা নেই। এদেশের বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ ও হিপনোটিস্ট প্রফেসর এম. ইউ. আহমেদ (ঢাকা কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল) বলছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। বেশির ভাগ লোকই নাকি প্রথমে ঘোষণা করে যে তাকে সম্মোহিত করা খুব কঠিন হবে—মনটা খুব শক্ত তার। এই সব লোকেরাই নাকি চট্ করে গভীর স্তরে চলে যায়, আর যারা সন্দেহপ্রবণ, মিনমিনে স্বভাবের লোক, তাদের সম্মোহিত করা সত্যিই কঠিন কাজ।

বিদেশী হিপনোটিস্টদের অভিজ্ঞতাও এই একই রকম। সুস্থ, সবল মনের অধিকারী সহজে সম্মোহিত হয়। বুদ্ধির সাথেও এর সম্পর্ক রয়েছে। বুদ্ধিমানেরা সহজে সম্মোহিত হতে পারে। কিন্তু গর্দভ বা পলায়নী মনোবৃত্তির লোকেরা কিছুতেই সম্মোহিত হতে পারে না। সাজেশনের প্রতি মনোযোগই দিতে পারে না তারা। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। আরও অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে ব্যাপারটা। ভয় বা সন্দেহ থাকলে সম্মোহিত হওয়া কঠিন। তাছাড়া, সম্মোহনকারীর

যোগ্যতার উপরও অনেক কিছু নির্ভর করে।

খুব সহজে সম্মোহিত হতে পারে শিশুরা। সমালোচনা ছাড়াই যে-কোন সাজেশন গ্রহণ করতে তারা অভ্যস্ত—নইলে দ্রুত শেখা যায় না। এটা কি, ওটা কি, জিজ্ঞেস করে ওরা সর্বক্ষণ, উত্তরে যা বলা যায়, একেবারে উদ্ভট কিছু না হলে মেনে নেয়। কলম, বালিশ, চচ্চড়ি, আম, জাম, ঘাস যেটাকে যা বলছেন, মেনে নিচ্ছে ওরা— শিখে নিচ্ছে। যা বোঝানো যায় তাই বোঝে। আমার ছেলেটার মুখে সর্বক্ষণ খৈ ফুটছে গালির। যেখানে যেটা শুনেছে সযত্নে জমা করে নিয়েছে নিজের শব্দ ভাণ্ডারে। ওর প্রিয় গালি ছিল—কুত্তার বাচ্চার বাচ্চার বাচ্চার বাচ্চা। ওর ধারণা যত বাচ্চা বলবে ততই কঠিন হবে গালিটা। ওকে বোঝালাম, যত বাচ্চা হবে ততই ছড়িয়ে যাবে ওটা, ভাগ হয়ে যাবে অনেক বাচ্চার মধ্যে, নরম হয়ে যাবে গালির জোর। টপ করে মেনে নিল। এখন আমাকেই শুধু চতুষ্পদে পরিণত করছে, আমার বাপ-দাদাকে আর টানাটানি করছে না।

এই মেনে নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে বলেই শিশুদের সম্মোহিত করা সহজ। ছয় থেকে আট বছরের শিশু সম্মোহনের জন্যে সবচেয়ে ভাল সাবজেক্ট। তারপর থেকেই ক্ষমতাটা কমে যেতে থাকে বয়সের সাথে সাথে। বেশি বয়স্ক মানুষকে সম্মোহিত করা খুবই কঠিন। ত্রিশের পর থেকে মানুষের মনের গ্রহণ ক্ষমতা দ্রুত কমতে থাকে।

অঙ্কের হিসেব করলে দেখা যাবে প্রতি বিশ জনের মধ্যে একজন সম্মোহিত হবে না কিছুতেই, বাকি উনিশজন কম বেশি হবে। সম্মোহনের মাধ্যমে আমরা যেসব আত্মোন্নয়নমূলক কাজে হাত দিতে চাই সেগুলোর জন্যে হালকা সম্মোহনই যথেষ্ট। এটা ভরসার কথা। সোমনামবিউলিস্টিক বা গভীরতম স্তরে পৌঁছুতে পারে শতকরা মাত্র আট থেকে দশ জন। মাঝারি স্তরে যেতে পারে শতকরা ষাট জন, হালকা স্তরে শতকরা পঁচানব্বইজন।

আত্মসম্মোহনেরও এই একই হিসেব।

আপনি ঠিক কোন্ দলে পড়বেন সেটা বোঝার নিয়ম আছে, সে-সব নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। তবে মোটামুটিভাবে ধরে নিতে পারেন, অন্তত হালকাভাবে সম্মোহিত হতে আপনি পারবেন।

সম্মোহন: কি কি সম্ভব

সম্মোহনের সাহায্যে কি কি সম্ভব তা আমরা মোটামুটি জানি। কিন্তু সম্মোহন জিনিসটা আসলে কি তার সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি কেউ।

ব্যাপারটা ইলেকট্রিসিটির মত অনেকটা। জিনিসটা কি তা আজও জানা সম্ভব হয়নি—কিন্তু দিব্যি ব্যবহার করছি আমরা সেটা, কাজে লাগিয়ে উপকৃতও হচ্ছি।

সম্মোহনকে বর্ণনা করা যায়—এটা একটা পরিবর্তিত চেতন অবস্থা, চিন্তা-ভাবনাগুলো এই সময় আসছে সরাসরি অবচেতন মন থেকে, এমন এক বিশ্রামের অবস্থা যখন মনটা সহজভাবে মেনে নেয় যে-কোন সাজেশন। কেন এমন হয়, কেউ জানে না।

গভীর স্তর আর হালকা স্তরে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, কিন্তু উভয় স্তরেই চেতন মনটা তলিয়ে যায় নিচে, অবচেতন মনটা উঠে আসে উপরে। এই সময় মানুষের প্রচণ্ড শক্তিশালী অবচেতন মনের সাথে যোগাযোগ করা সহজ হয়।

এবার, সম্মোহন বা আত্মসম্মোহন কি কি কাজে লাগে সে সম্বন্ধে আরও দু'চার কথা বলে নিই, তাহলে এই বিদ্যাটির দ্বারা ঠিক কি সাহায্য পেতে পারেন, পরিষ্কার একটা ধারণা হয়ে যাবে আপনার।

সম্মোহনের সাহায্যে ব্যথা দূর করা যায়। দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, অসহ্য ঠেকছে সবকিছু—এই সময় কোন কিছুর সাহায্যে ব্যথাটা দূর করতে পারলে দারুণ হয় না? এটা সম্মোহনের দ্বারা সম্ভব। মাঝারি স্তরে পৌঁছুতে পারলেই যে কেউ এইভাবে যে-কোন শারীরিক অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন। অন্তত ব্যথার তীব্রতা যে অনেকখানি কমিয়ে নিতে পারেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সম্মোহনের সাহায্যে পূর্ণ অচৈতন্য বা শরীরের অংশ বিশেষকে অসাড় করে নিয়ে বড় বড় সার্জিক্যাল অপারেশন করছেন অনেকে। কোনরকম ওষুধের সাহায্যে অজ্ঞান করার প্রয়োজন পড়ছে না, সম্মোহনের সাহায্যে প্রয়োজনীয় অঙ্গ অসাড় করে নিয়ে হাত বা পা

কেটে বাদ দিয়ে দেয়া হচ্ছে, বুক চিরে হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার হচ্ছে, একটা ফুসফুস কেটে বের করে আনা হচ্ছে—বিন্দুমাত্র ব্যথা পাচ্ছে না রোগী। সাধারণত অপারেশনের সময় অ্যানাসথেটিক ওষুধ দেয়ারই নিয়ম—কিন্তু কারও কারও শরীরে বিশেষ কারণে অ্যানাসথেটিক ওষুধ সহ্য হয় না, তাদের জন্যে সম্মোহনের সাহায্যে অঙ্গ অসাড় করাটা অত্যন্ত উপকারী পদ্ধতি।

অ্যানাসথেটিক ওষুধ আবিষ্কারের আগে যে-কোন সার্জিকাল অপারেশন রোগীর জন্যে ছিল ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়বার আগে পর্যন্ত তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে তাদের। এখন অবস্থা অনেক ভাল, কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গায় সব ওষুধ পাওয়া যায় না—বিশেষ করে যুদ্ধাবস্থায় তো ওষুধ হয়ে ওঠে মহার্ঘ্য। সেই সময় হিপনোটিক অ্যানাসথেশিয়া বিরাট এক ভূমিকা পালন করতে পারে।

আঠারোশো চল্লিশ সালে জেমস এসডেইল বলে এক ব্রিটিশ সার্জেন ভারতে তিন হাজার রোগীকে অপারেশন করেছিলেন সম্মোহনের সাহায্যে অঙ্গ অসাড় করে নিয়ে। কিন্তু এর তেমন প্রসার হয়নি। কারণ এর কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার হয়ে গেল যে ক্লোরোফর্ম এবং ইথার দিয়ে মানুষকে অজ্ঞান করা যায়। এখন শুধু যেখানে ওষুধ চলে না সে-সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে সম্মোহনের। আর ব্যবহার হচ্ছে নারীর সন্তান প্রসবের কষ্ট দূর করার কাজে।

কোরিয়ার যুদ্ধে এক সৈনিক আত্মসম্মোহনের সাহায্যে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছিল। বোমায় দুটো হাতই উড়ে গিয়েছিল তার, রক্ত বন্ধ করতে না পারলে ট্রেঞ্চের ভেতরেই শুয়ে শুয়ে রক্তক্ষরণে মারা যেত সে। বাইরে থেকে সাহায্য আসতে অনেক দেরি হবে বুঝতে পেরে আত্মসম্মোহিত হয়ে শিরাগুলোকে সঙ্কুচিত হওয়ার আদেশ দিল সে, সেইসাথে সাজেশন দিল অসাড় হয়ে যাক তার হাত দুটো, দূর হয়ে যাক ব্যথা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কমে গেল রক্তক্ষরণ, তারপর বন্ধ হয়ে গেল। ছ'ঘন্টা পর উদ্ধার করা হয় তাকে। আজও বেঁচে আছে সেই লোক।

সম্মোহনের সাহায্যে মানুষ তার অতীতে ফিরে যেতে পারে। আমাদের জীবনে আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, আজ পর্যন্ত যা কিছু দেখেছি, শুনেছি বা অনুভব করেছি, সব জমা আছে আমাদের স্মৃতিতে। সচেতনভাবে স্মরণ করার চেষ্টা করলে এত কিছুর অতি সামান্যই মনে

আসে। কিন্তু সম্মোহিত অবস্থায় প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি শুধু স্মরণ করতে পারা নয়, সেই অতীতের ঘটনাতেই ফিরে যেতে পারে মানুষ—তখন যেমন লেগেছিল ঠিক সেই অনুভূতিগুলো আবার অনুভব করতে পারে। যদিও ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখনকার মত ততটা তীব্রতা থাকে না—একটা দ্বৈত মনোভাব রয়ে যায়—তবু আশ্চর্য স্পষ্টভাবে পুনরাবৃত্তি হয় অভিজ্ঞতার। এর জন্যে সম্মোহনের হালকা স্তরে পৌঁছুতে পারলেই যথেষ্ট।

মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসায় সম্মোহনকে কাজে লাগিয়ে খুব অল্প সময়ে রোগীকে ভাল করে তোলা হচ্ছে আজকাল। শৈশবের ঠিক যে-সব ঘটনা রোগীর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করেছে আবার সে সবের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। অতীতের ঘটনায় ফিরে যাচ্ছে সে ঠিকই, কিন্তু বর্তমানের পরিণত মনটাও যাচ্ছে সাথে। ফলে নতুন এক অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ফিরে আসছে বর্তমানে।

পুলিসের কাজেও এটা ব্যবহারের নজির আছে। লস এঞ্জেলসে একবার এক জুয়েলারীর দোকানে ডাকাতি হলো। দু'জন দুষ্কৃতকারী পিস্তল দেখিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বহু টাকার অলঙ্কার। ওরা যখন মাল নিয়ে গাড়িতে উঠেছিল ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একজোড়া নবদম্পতি। পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে কেউই বলতে পারল না গাড়িটার নম্বর। এমন কি নাম্বার প্লেটের দিকে ওরা তাকিয়েছিল কিনা সে কথাও স্মরণ করতে পারল না। তখন দু'জনকে আলাদা ভাবে সম্মোহিত করে অতীতে নিয়ে গিয়ে দেখা গেল নিজের অজ্ঞাতে দু'জনেই দেখেছিল নাম্বার প্লেট—দু'জনের দেয়া নম্বর এক ও অভিন্ন। দুষ্কৃতকারী দু'জনকে খুঁজে বের করতে আর তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি পুলিসের।

আরেকটা দরকারী কাজে লাগে এই অতীতের ঘটনায় প্রত্যাবর্তন। কোন প্রয়োজনীয় জিনিস, চাবি বা চিঠি হারিয়ে ফেলেছেন, কিংবা কোথায় যে রেখেছেন তা কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। অতীতে ফিরে গেলেই বেরিয়ে পড়বে জিনিসটা। আপনার অবচেতন মন ঠিকই জানে কোথায় হারিয়েছেন ওটা। ওর চোখে ধুলো দেয়ার উপায় নেই, সব সময় সতর্ক রয়েছে মনের এই অংশটা—আপনি যখন ঘুমিয়ে আছেন, কিংবা কোন কারণে জ্ঞান হারিয়েছেন, তখনও। এজ রিগ্রেশন বা এই অতীতে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে অজ্ঞান অবস্থায় সার্জিকাল অপারেশনের সময় কি কি ঘটেছিল, কে কি বলেছিল সব স্মরণ করতে পারে মানুষ।

সার্জেন যাঁরা এটা জানেন তাঁরা এই অজ্ঞান অবস্থাতেও রোগী সম্পর্কে বেফাঁস কোন কথা বলেন না, বরং এমন সব কথা বলেন যা রোগীর দ্রুত নিরাময়ের সহায়ক হয়। বড় কোন অপারেশনের পর রোগীর মধ্যে যে শক-রিঅ্যাকশন হয়, প্রস্রাব চেপে রাখার প্রবণতা দেখা দেয়, সে সব অনেকাংশে কমিয়ে দেয়া যায় অজ্ঞান অবস্থায় তার অবচেতন মনের মধ্যে উপযুক্ত মনোভাব ঢুকিয়ে দিয়ে।

মেসমারের সময় সম্মোহনের সাহায্যে যা যা সম্ভব তার বেশিরভাগই আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১৮২৩ সালে সম্মোহনের সাহায্যে মাঁড়ি অসাড় করে নিয়ে দাঁত তোলার কথা জানা যায়। তার পরপরই সম্মোহিত অবস্থায় বেদনাহীন সন্তান প্রসব করেন এক মহিলা। হঠাৎ বছর বিশেক আগে আর একটি ব্যাপার আবিষ্কার করেছেন ড. লিন কুপার। উনি এর নাম দিয়েছেন টাইম ডিসটরসন।

আমরা সবাই জানি, খুব অল্প সময়ের মধ্যে লম্বা-চওড়া এক স্বপ্ন দেখে ওঠা সম্ভব। জানি, পানিতে ডুবন্ত মানুষ অনেক সময় জীবনের বহু ঘটনার ছবি দেখতে পায় কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।

চিন্তার এই অস্বাভাবিক দ্রুততা আনা যায় সম্মোহনের সাহায্যে। এজন্যে অবশ্য গভীর স্তরে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। তিন ঘন্টার পিয়ানো, অর্গ্যান বা টাইপরাইটার অনুশীলন এইভাবে তিন সেকেণ্ডে সেরে নেয়া সম্ভব। আসল প্র্যাকটিসের সমান না হলেও অনেকটা কাজ হয় এই মানসিক প্র্যাকটিসে।

সাজেশন দিয়ে সম্মোহিত ব্যক্তির সমস্ত শরীর শক্ত, আড়ষ্ট করে দেয়া যায়। স্টেজে যাঁরা সম্মোহনের শো দেখান, তাঁরা প্রায়ই করে থাকেন এটা। শক্ত হয়ে যাওয়া শরীরটা তুলে নিয়ে মাথাটা এক চেয়ারে রেখে পা রাখা হয় আরেক চেয়ারে, তারপর তার পেটের উপর উঠে দাঁড়ান হিপনোটিস্ট। একেবারে সটান সোজা হয়ে শুয়ে থাকে সম্মোহিত ব্যক্তি একটুও না বেঁকে। যদিও, এই ধরনের খেলা দেখানো বিপজ্জনক।

সম্মোহনের সাহায্যে মানুষের দৃষ্টি বা শ্রুতিভ্রম ঘটানো সম্ভব। কিন্তু এটাও বিপজ্জনক হতে পারে মনে করে আমরা বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকছি। আত্মসম্মোহিত হয়ে ওসব চেষ্টা করা ঠিক হবে না আপনার।

সম্মোহনের লক্ষণ

সম্মোহনের খুব হালকা স্তরে আমরা সবাই যাই দিনে কয়েকবার করে, কিন্তু টের পাই না। কাজে মগ্ন অবস্থায়, এবং বিশেষ করে ভয়, রাগ বা অনুরূপ জোরাল ভাবাবেগের সময় আমরা নিজের অজান্তেই সম্মোহিত হয়ে পড়ি।

নিয়ম অনুসরণ করে আপনি যখন সম্মোহিত হবেন তখন লক্ষ্য করবেন চোখের পাতা দুটো কাঁপছে অল্প অল্প। এটা হালকা সম্মোহনের লক্ষণ। কারও কারও বেশি ঢোক গিলবার প্রবণতাও দেখা যায়। আর একটু গভীরে গেলেই এই কাঁপন বা ঢোক গেলা বন্ধ হয়ে যায়। সম্মোহিত অবস্থায় নড়াচড়া করা যায়, কিন্তু একটা আলস্য ভাব আসে বলে নড়তে চায় না কেউ। সচেতন, জাগ্রত অবস্থায় আমরা খানিক পরপরই শুয়ে থাকলে পাশ ফিরছি, কিংবা বসে থাকলে কাত হচ্ছি, কিন্তু সম্মোহিত অবস্থায় যেমন আছি তেমনি থাকব বহুক্ষণ পর্যন্ত। এমন কি নাকের উপর মাছি বসলেও তাড়াতে ইচ্ছে হবে না।

সম্মোহিত অবস্থায় শরীরের পেশীগুলো শিথিল হয়ে যায়, ভাবলেশহীন হয়ে যায় মুখের চেহারা। শ্বাস-প্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত গভীর হবে। পালস বিট কমে যাবে খানিকটা। মাঝারি স্তরে পৌঁছুলে দেখা যায় চোখের পাতা বন্ধ অবস্থাতেও চোখ দুটো নড়াচড়া করছে। সামান্য ফাঁকও হয়ে যেতে পারে পাতা দুটো।

এছাড়া আর সব লক্ষণ ঘুমেরই মত। সম্মোহন থেকে জেগে উঠে ঘুম থেকে ওঠার মতই সাধারণত চোখ ঘষে মানুষ।

গভীরতা

আর কারও দ্বারা সম্মোহিত হলে সে আপনার শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ করে টের পাবে ঠিক কতটা গভীর স্তরে পৌঁছেছেন আপনি। তার পক্ষে এটা খুব সহজ। ভাবলক্ষণ দেখে তেমন কিছু আঁচ করতে না পারলে

ছোটখাটো কয়েকটা পরীক্ষার মাধ্যমে সহজেই বুঝে নেয়া যায় গভীরতা। আপনার কোন অঙ্গ অসাড় করে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারে, যে-কোন একটা হাতকে বেলুনের মত হালকা করে উপরে ভাসিয়ে তুলতে পারে, কিংবা একটা হাত আড়ষ্ট করে দিয়ে দেখতে পারে নড়াতে পারেন কিনা।

কিন্তু আত্মসম্মোহনের সময় বাইরে থেকে সাহায্য পাচ্ছেন না আপনি, সম্মোহনের গভীরতা বুঝতে হলে নির্ভর করতে হবে নিজেরই অবচেতন মনের দেয়া তথ্যের উপর।

মনে মনে একটা এক গজ লম্বা কাঠি বা ফিতে কল্পনা করুন—এক ইঞ্চি পর পর একটা করে কালো দাগ কাটা আছে তাতে। বারো এবং চব্বিশ ইঞ্চির জায়গায় গভীর লাল দাগ। ভেবে নিন প্রথম এক ফুট হালকা স্তর, দ্বিতীয় ফুট মাঝারি স্তর এবং তৃতীয় ফুট হচ্ছে গভীর স্তর।

সম্মোহিত অবস্থায় এই গজ কাঠিটি কল্পনা করুন চোখের সামনে—হালকা দিকটা উপরে। কল্পনার চোখে একটা তীর বা ইণ্ডিকেটর তৈরি করে নিন। প্রথম ইঞ্চিতে সেট করা আছে সেটা। এবার নিজেকে সাজেশন দিন তীরটা প্রথম ইঞ্চি ছেড়ে নিচে নামতে শুরু করবে, আপনি সম্মোহনের যে স্তরে রয়েছেন ঠিক সেখানে এসে থামবে কাঁটা। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাবেন নেমে আসছে ইণ্ডিকেটরের কাঁটা, কোন এক জায়গায় এসে থেমে দাঁড়াবে ওটা। কত ইঞ্চিতে দাঁড়াল দেখে নিলেই আপনি বুঝতে পারবেন ঠিক কতটা গভীরতায় পৌঁছেচেন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই মাপটা প্রায় সব ক্ষেত্রেই সঠিক গভীরতা নির্দেশ করে। ভুলের সম্ভাবনা খুবই কম।

কি কি উপকারে আসে

সম্মোহনের সাহায্যে অবচেতন মনকে দিয়ে শরীরের উপর নানান ধরনের প্রভাব বিস্তার করানো যায়। কেন এটা হয় তা নিয়ে গবেষকরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু সাধারণ ভাবে আমরা ধরে নিতে পারি আমাদের ভিতরের মনটা শরীরের অভ্যন্তরীণ কলকজাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করার

ক্ষমতা রাখে।

দ্রুত নিরাময় এবং রক্ত সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আগেই বলেছি। সাজেশন দিয়ে হার্ট বিট এবং শরীরের উত্তাপ বাড়ানো কমানো যায় অনায়াসে। সম্মোহিতকে যদি বলা হয়, ঘরটা অসম্ভব ঠাণ্ডা, তাহলে শীত গায়ে কাঁটা দেবে তার, ঠক ঠক করে কাঁপবে। তেমনি অতিরিক্ত গরমের সাজেশন দিয়ে গায়ে ঘামাচি উঠিয়ে দেয়া সম্ভব। শরীরের উপর অবচেতন মনের ঠিক কতখানি ক্ষমতা তা পুরোপুরি জানা যায়নি এখনও, তবে হজম ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করা গেছে অতি সহজে। ঋতুস্রাবের গোলমাল সারিয়ে তোলারও খবর পাওয়া গেছে। সম্মোহন সম্পর্কে আরও যত জ্ঞানের প্রসার হবে ততই জানা যাবে কি কি কাজে একে ব্যবহার করে মানুষ উপকৃত হতে পারে। বর্তমানে শারীরিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যেটুকু জানা গেছে তার থেকে উপকৃত হচ্ছে বহু রোগী।

মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় সম্মোহনকে ব্যবহার করে আশ্চর্য সব ফল পাওয়া গেছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে আত্মসম্মোহনের সাহায্যে প্রভূত উপকার পেয়েছে অসংখ্য মানুষ। চারিত্রিক দুর্বলতা, বদভ্যাস এবং হালকা স্নায়বিক বৈকল্য সারিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে উপযুক্ত নিয়মে আত্মসম্মোহনের সাহায্যে। নিদ্রাহীনতা, মোটা হয়ে যাওয়া, তোতলামি ইত্যাদির জন্যে সম্মোহনের বাড়া আর কোন চিকিৎসা বা ওষুধ নেই।

শিক্ষার ব্যাপারেও অনেক সাহায্য পাওয়া যেতে পারে আত্মসম্মোহনের কাছ থেকে। অনেকের অভিযোগ, মন বসাতে পারেন না—আমার ভাই কনসেনট্রেশন নেই, স্মরণ-শক্তি কম। আত্মসম্মোহনের সাহায্যে অনায়াসে যে-কোন কাজে মন বসাতে পারবেন এঁরা। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে এ থেকে। সম্মোহিত অবস্থায় চোখ খোলা রাখা এমন কিছু কঠিন নয়। এই ভাবে আশপাশের প্রতিকূল পরিবেশ উপেক্ষা করে চঞ্চল বা বিক্ষিপ্ত মন যে কোন কাজে বসানো সম্ভব। এর ফলে কাজটাও অনেক ভাল ভাবে সম্পন্ন করা যায়।

এমন কি সম্মোহিত অবস্থায় পরীক্ষা দেয়াও সম্ভব। এই অবস্থায় উত্তরগুলো একের পর এক ভেসে উঠবে মনের পর্দায়। আত্মসম্মোহন জানা থাকলে নিজেকে দিয়ে বহু কিছুই করিয়ে নেয়া যায়।

ক্লান্তি আর একটা ব্যাপার। ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমাদের শরীরের টিস্যুগুলোয় রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন বন্ধ করে দিতে পারে

অবচেতন মন। ক্লান্ত হয়ে পড়লে খুব অল্প সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে। পাঁচ মিনিটে দূর হয়ে যাবে ক্লান্তিবোধ। অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লে আত্মসম্মোহনের সাহায্যে খুব অল্প সময়েই আবার সজীব, প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারেন আপনি ইচ্ছে করলেই।

তবে এটা সব সময়ই খেয়াল রাখা দরকার—সম্মোহন কোন যাদুমন্ত্র নয়, এর কাছ থেকে অলৌকিক কিছু আশা করা ভুল। এটা অবচেতন মনের কাছে পৌঁছুবার সহজ একটা উপায় মাত্র। সবাই সব কিছু পারবেন, তা নয়। সব সময় সাজেশনে কাজ হবেই তারও কোন নিশ্চয়তা নেই, যে ফল আশা করা যায় তা হয়তো পুরোটা পাওয়া যায় না। এটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরের একটা ব্যাপার, এর সম্পর্কে সব কিছু জানা যায়নি আজও। কাজেই এটা নিয়ে যা খুশি তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ঠিক না। যা-তা সাজেশন দেয়াও ঠিক না। এর ফলে ক্ষতি হতে পারে।

কিভাবে সাজেশন দিলে অবচেতন মন সহজে গ্রহণ করে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে। সেই সাথে আলাপ করা যাবে—কেমন ধরনের সাজেশন দিলে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

অটোসাজেশন

ইংরেজি সাজেশন শব্দটার ঠিক উপযুক্ত প্রতিশব্দ পেলাম না বলে এটাকেই রেখে দিচ্ছি। 'উপদেশ' শব্দটি তো এ প্রসঙ্গে একেবারেই খাপছাড়া। 'পরামর্শ'ও ঠিক না। ইঙ্গিত, সঙ্কেত, প্রস্তাব, নির্দেশ—শব্দগুলো অনেকটা কাছাকাছি যায়, কিন্তু এগুলোকে সাজেশনের সঠিক প্রতিশব্দ বলা যায় না। কাজেই থাকুক ওটাই।

আমরা জানি সাজেশনের সাহায্যে অবচেতন মনকে প্রভাবিত করা যায়। এ-ও জানি অবচেতন মনটা বিশ্লেষণ করে না কোনকিছুই—যেটা যেমন ভাবে তার সামনে হাজির করা হয় সেটাকে ঠিক তেমনি ভাবে সে গ্রহণ করে।

আমরা সবাই কমবেশি প্রভাবিত হই সাজেশনের দ্বারা। এই সাজেশন জিনিসটাই ব্যবহার করবেন আপনি আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে।

তাই কিভাবে ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভাল ও বেশি ফল পাওয়া যায়, বুঝে নেয়া দরকার আপনার।

অটো-সাজেশনের চেয়ে হিটারো-সাজেশনের শক্তি অনেক বেশি। আপনি নিজেকে নিজে যা বলবেন অবচেতন মন সেটাকে যত তাড়াতাড়ি গ্রহণ করবে, তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি গ্রহণ করবে যদি সেই একই কথা আর কেউ বলে। যাই হোক, আত্মসম্মোহিত হয়ে আর কাউকে যখন সব সময় পাচ্ছেন না, তখন নিজে নিজে এর থেকে যতটা ফায়দা ওঠানো যায় ততই লাভ।

সাজেশন জিনিসটা আদেশের মত করেও বলা যায়, আবার সাদামাঠা বক্তব্য পেশের মত করেও বলা যায়। সরাসরি বলা যায়, আবার ঘুরিয়েও বলা যায়। হাঁ-সূচক ভাবে বলা যায়, না-সূচক ভাবেও বলা যায়। কিন্তু অটো-সাজেশন সাধারণত ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে সহজ ভাষায় সরাসরি বলা হয় হাঁ-সূচক বাক্যের সাহায্যে—কখনও আদেশের মত, কখনও সাদামাঠা বক্তব্যের মত। না-সূচক বাক্য পারতপক্ষে ব্যবহার করা উচিত নয়। 'আমার মধ্যে মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছে থাকবে না।'—এটা একটা না-সূচক বাক্য। এটাকেই ঘুরিয়ে হাঁ-সূচক করা যায়: 'মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস থেকে আমি মুক্ত হব।'

জোরের সাথে আদেশ করলে অবচেতন মন সেটা গ্রহণ করতে চায় না। তারচেয়ে তার সামনে সাদামাঠা ভাবে বক্তব্য রাখলে সাধারণত ফল হয় বেশি। আদেশ কেউই পছন্দ করে না, আপনার অবচেতন মনের বেলায়ও কথাটা সত্যি। কাজেই আদেশ না করে তার কাছ থেকে ভজিয়ে-ভাজিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ আদায় করে নেয়াই ভাল। কিন্তু কারও কারও ক্ষেত্রে আবার আদেশেই কাজ হয় বেশি। এটা নির্ভর করে যার যার বিশেষ ব্যক্তিগত মানসিকতার উপর। অনেকের মধ্যে হুকুম তামিল করার একটা প্রবণতা থাকে। তাদের জন্যে আদেশেই কাজ হয় বেশি।

'তুমি নখ কামড়ানো ছেড়ে দেবে,' কথাটা সাদামাঠা বক্তব্য, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে এটা আদেশ হয়ে উঠতে পারে। আবার, 'নখ কামড়ানো তোমাকে ছাড়তেই হবে,' বলাটা বলার ভঙ্গিতে দুর্বল, অনুরোধের মতও হয়ে যেতে পারে। কি ধরনের সাজেশন আপনার জন্যে ভাল সেটা আপনাকেই বুঝে নিতে হবে নানান ধরনের সাজেশন দিয়ে ফলাফল দেখে।

যে-কোন সাজেশন মনের মধ্যে বসাবার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে পুনরাবৃত্তি। ত্রিশ কি চল্লিশবার কিংবা তারও বেশিবার পুনরাবৃত্তি করা দরকার প্রত্যেকটা সাজেশন। বিজ্ঞাপনে এই পুনরাবৃত্তিকে ব্যবহার করা হয় খুব বেশি। আপনাকে যদি প্রশ্ন করি: সবচেয়ে ভাল আলকাতরা কোনটা? আপনি বলবেন: ···মার্কা আলকাতরা। কেন ওই নামটা মনে এল আপনার? রেডিও-টিভি আর খবরের কাগজের মাধ্যমে এত বেশিবার আপনার সামনে তুলে ধরা হয়েছে নামটা, এতবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে বসে গেছে ওটা আপনার মনের মধ্যে। হয়তো জীবনে চোখেও দেখেননি ওই আলকাতরা, জানা নেই ওটার রঙ কালো না লাল—অথচ ওই নামটাই বেরিয়ে আসছে মুখ দিয়ে।

এসব বিজ্ঞাপনের সুপরিচিত কৌশল। কোন কারণে যদি আপনার আজ আলকাতরা প্রয়োজন হয়, বাজারে গিয়ে সোজা ওই নামটা উচ্চারণ করবেন আপনি, খুশি মনে ওটা কিনে নিয়ে আসবেন—ভাল বা মন্দ দেখবেন না; ওর চেয়ে আরও ভাল কোন আলকাতরা আছে কিনা সে খোঁজও হয়তো করবেন না। আপনার অবচেতন মনের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে নামটা। তেমনি ব্যাটারি, সাবান, বিস্কিট, বা ওই রকম আরও জিনিসের নাম ভাবার চেষ্টা করে দেখুন—দেখবেন কেমন চট্ করে একটা নাম লাফিয়ে এসে হাজির হয় মনের মধ্যে। প্রস্তুতকারকেরা খামোকা বিজ্ঞাপন দেয় না। সাজেশন ও সম্মোহনের নিয়মকানুন-পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকলে এরা আরও অনেক জোরালভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত নিজেদের।

পুনরাবৃত্তি হলো, কিন্তু সেই সাথে আপনার বক্তব্য অনুযায়ী কাজ করার জন্যে যথেষ্ট সময় দেয়া দরকার অবচেতন মনকে। বাক্যটা এমন ভাবে গঠন করতে হবে যেন ঠিক এই মুহূর্তে কিছু করতে বলছেন না আপনি—আগামী কিছুক্ষণ বা কয়েক দিনের মধ্যে করতে বলছেন। জর্দা দিয়ে পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু খাওয়ার প্রবল ইচ্ছে, সেই অবস্থায় যদি আপনি সাজেশন দেন: জর্দা দিয়ে পান খেতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না—তাহলে মারাত্মক ভুল হবে। প্রথম কথা: এটা নির্জলা মিথ্যে। মিছে কথা সহ্য করবে না আপনার অবচেতন মন। দ্বিতীয়তঃ, এটা না-সূচক বাক্য। তৃতীয়তঃ, কোন সময় দিচ্ছেন না আপনি অবচেতন মনকে। যদি বলেন: কিছুক্ষণের মধ্যেই জর্দা দিয়ে পান খাওয়ার ইচ্ছেটা দূর হয়ে যাবে, ভুলে যাব ওর কথা—তাহলে বক্তব্যটা হাঁ-সূচক হচ্ছে, আর কথাটা

গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী কাজ করবারও সময় পাচ্ছে আপনার অবচেতন মন।

অটো-সাজেশন দেয়ার সময় কথাগুলো জোরে উচ্চারণ না করে মনে মনে চিন্তা করলেও চলে। তবে অনেকে আবার মুখে উচ্চারণ করলে উপকার পায় বেশি, আপনার জন্যে যেটা সুবিধে হয় তাই করবেন—ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই।

কোন সাজেশনের পিছনে যদি অনুপ্রেরণা বা অন্তরের তাগিদ থাকে তাহলে চট্ করে মেনে নেয় সেটা অবচেতন মন। বদভ্যাস ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছেটা আপনার যত জোরাল হবে ততই সহজ হবে ছেড়ে দেয়া। নিজের মধ্যে কোনও একটা ভাবাবেগ সৃষ্টি করে সেটা যদি আপনার সাজেশনের সাথে যুক্ত করতে পারেন তাহলে দারুণ ফল পাবেন। কোন কথা বা কাল্পনিক ছবি বা এই দুইয়ের সংমিশ্রণে ভাবাবেগ তৈরি করে নিতে পারেন। বদভ্যাস ছাড়তে পারলে কেমন বিজয়ীর মনোভাব আসছে আপনার মধ্যে সেটা কল্পনা করতে পারেন, কিংবা বিফল হলে বন্ধু-বান্ধবদের সামনে কেমন লজ্জায় পড়ছেন তার কাল্পনিক ছবি দেখতে পারেন।

যে-কোন সাজেশন কার্যকরী করবার ব্যাপারে কাল্পনিক ছবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সাজেশনের কথাগুলোর সাথে যদি কল্পনা যুক্ত হয় তাহলে দুইয়ে মিলে গভীর ছাপ ফেলতে পারে অবচেতন মনের উপর। বার বার কোন ছবি মানসচক্ষে দেখলে অবচেতন মন সেটাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করে থাকে। কেন হয় জানা নেই, তবে এটা হয়। মানসচক্ষে চাহিদার ছবিটা যে যত স্পষ্ট দেখতে পাবে, তার চাহিদাটা ঠিক ততই দ্রুত পূরণ হবে। এটাই নিয়ম।

একবারে অনেক বেশি সাজেশন দিয়ে আপনার অবচেতন মনকে ভারাক্রান্ত করবেন না। যে-কোন একটা ব্যাপারে সাজেশন দেয়া ভাল। বড় জোর দুটো। আত্মবিশ্বাসী হতে চান, সুখী হতে চান, ওজন কমাতে চান, যৌন-জীবনে ভারসাম্য চান—সব যদি এক সাথে এক বৈঠকে চান তাহলে সব গুলিয়ে যাবে—কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না। অন্তত এক সপ্তাহ একটা সাজেশন নিয়ে থাকা ভাল, তারপর সেটা ছেড়ে আর একটা।

আরও একটা কথা। ফলাফল আপনি যা চান সেই অনুযায়ী সাজেশনের বাক্য তৈরি করুন। ঠিক কি চান সে ব্যাপারটা নিজে আগে

পরিষ্কার বুঝে নিন। আপনার চেতন মনের চেয়ে অনেক ভাল ভাবে জানা আছে অবচেতন মনের কি করে সেই লক্ষ্যে পৌছুতে হবে। একে যদি একবার রওনা করে দিতে পারেন, আর কোন চিন্তা নেই, ঠিক পৌছে যাবে লক্ষ্যে।

যত যা-ই সাজেশন দিন, সেটা অবচেতন মনকে দিয়ে গ্রহণ করানোটাই আসল কাজ—তা নইলে সব ফক্কা। কাজেই এ ব্যাপারে আপনার সতর্ক থাকতে হবে। সাদামাঠা বক্তব্য যদি বারবার পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও কিছুতেই গ্রহণ না করে, আদেশ করে দেখুন কাজ হয় কিনা। মনে মনে বললে যদি দেখেন সুবিধে হচ্ছে না, জোরে বলুন। 'আমি' বলে যদি দেখেন তেমন নড়েচড়ে না, নিজেকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করুন—যেন বাইরে থেকে আর কেউ আপনার অবচেতন মনকে বিশেষ কাজে উদ্বুদ্ধ করছে। সব রকম করে দেখুন,কিসে সবচেয়ে বেশি সাড়া পাওয়া যায়।

ম্যাক্স ফ্রিডম লঙ নামে এক ভদ্রলোক নানা ধরনের সাজেশন নিয়ে রীতিমত গবেষণা চালিয়ে কয়েকটি সত্যে উপনীত হয়েছেন। ওঁর 'সেলফ্-সাজেশন' বইয়ে সাজেশন দেয়ার সময় তিনি সবাইকে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই সময় গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে এবং সাজেশনের উপর একবার তীব্র মনোযোগ দিলে (এবং এইভাবে বার কয়েক মনোযোগের মাত্রা কম বেশি করলে) ভাল ফল পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন, অবচেতন মনকে দিয়ে যে সাজেশন গ্রহণ করাতে চান তার প্রতি আপনার যদি সচেতন বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকে তাহলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ডক্টর জেমস. এম. হিক্সন বলেন, অবচেতন মনকে দিয়ে যে বক্তব্যটা গ্রহন করাতে চান সেটাকে আগে বিস্তারিত ভাবে লিখে ফেলুন। তারপর সেটার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম লিখুন। তারপর আরও সংক্ষিপ্ত করে একটা বা দুটো লাইনে নিয়ে আসুন সেটাকে। বাড়তি কথা সব ছেঁটে ফেলে কেবল যেটা চান সেটা থাকুক। এই দুই লাইন থেকে একটা বা দুটো শব্দ বেছে বের করুন যেটা বললেই প্রথমে বিস্তারিত যা লিখেছিলেন তার ভাবধারাটা প্রকাশ পায়। এই শব্দটা বা শব্দ দুটো বার কয়েক বলতে হবে, তারপর চিন্তাটা বিষয়ান্তরে নিয়ে যেতে হবে। সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবনায়। আত্মসম্মোহিত অবস্থায় এই ভাবে সাজেশন দিলে ডক্টর হিক্সনের মতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ প্রফেসর এম. ইউ. আহমেদ বলেন, আপনি যা

চাইছেন সেটাকে হাঁ-সূচক একটা সংক্ষিপ্ত বাক্যে ধরতে হবে। তিনিও বলেন, কিভাবে কাজটা করতে হবে সেটা জানা আছে অবচেতন মনের, কাজেই আপনি যে ফলাফলটা চান বাগাড়ম্বরে না গিয়ে শুধু সেটারই উল্লেখ করুন সংক্ষেপে। এই একটি বাক্য দিয়ে আপনি ঠিক কি কি বোঝাতে চাইছেন ভেবে নিন ভাল করে। ধরুন, আপনি বাক্য তৈরি করলেন: আমি বড় হব। এই কথাটা দিয়ে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চান—শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক বা সামাজিক কোন্ দিক থেকে কোন্ বিষয়ে কত বড় হতে চান সে-সব ভাল করে বুঝে নিন একবার। তারপর সব চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিয়ে তোতাপাখির মত শুধু আওড়ে যান: আমি বড় হব, আমি বড় হব, আমি বড় হব···। যখন এই পুনরাবৃত্তি করছেন তখন এই বাক্যটি দিয়ে আপনি কি কি বোঝাতে চান সে-সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন নেই, অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই, ঘুমের আগে এবং ঘুম থেকে উঠে শরীর মন শিথিল করে দিয়ে মুখস্থ বুলির মত শুধু আওড়ে যান বিশ-ত্রিশ বা চল্লিশবার। এতেই কাজ হবে।

ফ্রান্সের এমিল কুয়ে অটো সাজেশনের ব্যাপারে জাঁদরেল এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর মতে প্রত্যেক সমস্যার জন্যে আলাদা আলাদা সাজেশন না দিয়ে একটা সাধারণ সর্বব্যাপী সাজেশন ব্যবহার করা ভাল। প্রত্যেকদিন বার বার করে বলতে বলছেন উনি: এভরি ডে ইন এভরি ওয়ে আই অ্যাম গেটিং বেটার অ্যাণ্ড বেটার। কথাটার বাংলা ভাবানুবাদ এরকম হতে পারে: দিন দিন সব দিক থেকে আমি আরও ভাল হচ্ছি। এই একটা কথায় সবই কাভার হয়ে যাচ্ছে।

কুয়ে বলছেন সাজেশন সব সময় হাঁ-সূচক হতে হবে। এমন কি চেষ্টা শব্দটিকেও বাদ রাখার উপদেশ দিচ্ছেন তিনি। 'চেষ্টা'র মধ্যে সন্দেহ রয়েছে—বিফল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যখনই আপনি বলছেন কোন কাজ করার চেষ্টা করবেন, বোঝা যাচ্ছে সফল হবেন কিনা সে ব্যাপারে আপনার মনে সন্দেহ রয়েছে। যাই করুন না কেন, হাঁ-সূচক মনোভাব নিয়ে কাজে নামা উচিত। আত্মসম্মোহন আপনি শিখতে যাচ্ছেন—শেখার চেষ্টা করতে নয়।

অল্পসময়ে আত্মসম্মোহন শেখার সহজতম উপায় হলো একজন সম্মোহনকারীর দ্বারা সম্মোহিত হওয়া। তিনি আপনাকে সম্মোহিত করে সাজেশন দেবেন, 'যখনই ইচ্ছে হবে তখনই নিজেকে সম্মোহিত করতে পারবে তুমি।' সম্মোহনকারীকে প্রফেশনাল হতেই হবে তার কোন মানে নেই। সম্মোহন সম্পর্কে যার নির্ভুল ধারণা আছে, তাকে দিয়েই চলবে। তবে, উপযুক্ত সম্মোহনকারী কাছে-পিঠে না-ও পেতে পারেন আপনি। সেক্ষেত্রে কারও সাহায্য ছাড়াই আত্মসম্মোহন শিখতে হবে আপনাকে। কারও সাহায্য ছাড়া দু'ভাবে আপনি শিখতে পারেন। এক, বুঝে নিয়ে এবং সচেতনভাবে এই বইয়ে দেয়া নির্দেশগুলো অনুশীলন করে। দুই, টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে। পরে এ-সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হবে।

প্রস্তুতি পর্ব

আগেই বলেছি, প্রভাবিত হওয়ার ক্ষমতা কমবেশি আমাদের সবার মধ্যেই আছে। এই ক্ষমতাটিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারলে আত্মসম্মোহনে সাফল্য অর্জন করা সহজ হয়ে দাঁড়াবে।

কয়েকটা প্রক্রিয়া অভ্যাস করলেই নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস জন্মে যাবে আপনার, আত্মসম্মোহন শিক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় মানসিক প্রস্তুতি হবে।

এক এক করে প্রতিটি প্রক্রিয়া অভ্যাস করুন। একটা আয়ত্তে না এলে অন্যটা ধরবেন না। প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা একা একা চর্চা করা দরকার।

প্রথমে কয়েকবার করে পড়ে নিন প্রক্রিয়াগুলো। ভাল মত বুঝে নিন ঠিক কি করতে হবে।

তারপর চেষ্টা করুন।

এক

আপনার মন যে ইচ্ছে করলে স্নায়ুগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে

তার প্রমাণ পাওয়া যাবে একটি সাধারণ ব্যাপারেই। একটি পেন্সিল নিন। হাতটা সোজা সামনের দিকে বাড়িয়ে তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে পেন্সিলটার একটা প্রান্ত চেপে ধরুন, অন্য প্রান্তটা নিচের দিকে ঝুলতে থাকুক। এই অবস্থায় আপনি ইচ্ছে করলেই আঙুল দুটো ফাঁক করে পেন্সিলটা ছেড়ে দিতে পারেন, পড়ে যাবে সেটা মাটিতে। মিনিটখানেক পেন্সিলের যে-কোন অংশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকুন যতটা সম্ভব চোখের পাপড়ি না ফেলে। এবার মনে মনে একটানা ভাবতে আরম্ভ করুন, 'পেন্সিলটা ফেলে দেব··· পেন্সিলটা ফেলে দেব··· পেন্সিলটা ফেলে দেব···।'অন্য কোন চিন্তা ঢুকতে দেবেন না মাথার ভিতর। আধ মিনিট এরকম একটানা ভাবতে ভাবতে পেন্সিলটা ফেলে দেবার চেষ্টা করে দেখুন, পারবেন না। যতই চেষ্টা করবেন, ততই এঁটে বসবে আঙুল দুটো পেন্সিলের উপর। আপনার সিরিব্রাল কর্টেক্স ও স্নায়ুমণ্ডলী সিদ্ধান্ত বিনিময় করতে পারছে না।

দুই

আরাম করে হেলান দিয়ে একটা চেয়ারে বসুন। পা দুটো মেঝেতে রাখুন। এবার মনস্থির করুন, যা বলা হচ্ছে ঠিক ঠিক পালন করবেন। দুই হাত সোজা রেখে কাঁধের সমান উঁচু করে সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরুন। হাতের তালু দুটো ছয় ইঞ্চি তফাতে পরস্পরের দিকে ফেরানো থাকবে। চোখ বন্ধ করুন। কল্পনা করুন আপনার ডান হাতের কব্জিতে শক্ত সুতো দিয়ে একটা গ্যাস বেলুন বাঁধা আছে, বেশ বড়সড় বেলুন, উপরে উঠে যেতে চাইছে বেলুনটা; আপনার হাতটাকেও টানছে, উপরে। ফলে আপনার হাতটা ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে উপরে। কল্পনায় স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করুন। বেলুনটার রঙ ও আকার কল্পনা করুন, কেমনভাবে বাঁধা আছে আপনার কব্জিতে কল্পনা করুন। বিশ্বাস করবার চেষ্টা করুন বেলুনটার অস্তিত্ব সত্যিই আছে, সত্যি সত্যি হাতটা উঠে যাচ্ছে উপরে, যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন আপনি হাতটাকে উপরে উঠে যেতে।

এবার কল্পনা করুন একটা শক্ত রশি দিয়ে বেশ ভারি একটা পাথর বাঁধা আছে আপনার বাম হাতের কব্জিতে। এটারও পরিষ্কার চিত্র ফুটিয়ে তুলুন কল্পনায়। পাথরটার আকার, কেমনভাবে বাঁধা আছে স্পষ্ট ছবির মত দেখতে পাচ্ছেন যেন, ওজনটা অনুভব করতে পারছেন। নিচে নেমে যেতে চাইছে হাতটা, নেমে যাচ্ছে।

এক মিনিট বাম হাতের কথা কল্পনা করেই ফিরে যান ডান হাতে। এক মিনিট ডান হাতের কথা কল্পনা করে ফিরে আসুন বাম হাতে। এভাবে কয়েকবার এক এক করে দুই হাতের অবস্থা কল্পনা করুন। তিন চার মিনিট পর চোখ খুলুন। যদি দেখেন সত্যি সত্যি ডান হাতটা বাম হাতের চেয়ে কয়েক ইঞ্চি উঁচুতে রয়েছে তাহলে পরবর্তী প্রক্রিয়ায় চলে যান। যদি হাত দুটো উঁচু-নিচু না হয় তাহলে আরও অভ্যাস করুন, আরও স্পষ্টভাবে কল্পনা করার চেষ্টা করুন। লক্ষ রাখবেন, ইচ্ছাকৃতভাবে হাত উঁচু-নিচু করলে চলবে না। যতক্ষণ আপনার অগোচরে আপনা আপনি উঁচু-নিচু না হচ্ছে ততক্ষণ চর্চা করতে থাকুন।

তিন

অন্তত ঘণ্টাখানেক সময় হাতে নিয়ে বসুন। তাড়াহুড়োর মধ্যে এই প্রক্রিয়া অভ্যাস করা যাবে না। আরাম করে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসুন, অথবা খাটে শুয়ে পড়ুন। একটা হাত চেয়ারের হাতলে বা খাটের কিনারায় এমন ভাবে রাখুন যেন হাতটা একটু সরালেই নিচে পড়ে যায়।

এবার চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন, শক্ত একটা দড়ি বাঁধা আছে আপনার হাতের কব্জিতে, দড়ির অপর প্রান্তে ভারি কিছু বাঁধা আছে, ঝুলছে সেটা আপনার হাত ও মেঝের মাঝামাঝি জায়গায়। ভারি বস্তুটার ওজনে টান পড়ছে আপনার কব্জিতে, হাতটা চেয়ারের হাতল বা খাটের কিনারা থেকে খসে পড়তে চাইছে নিচে। ওজনটার কথা ভাবুন, কল্পনা করুন। বিশ্বাস করুন যে সত্যি বেশ জোর টান পড়ছে আপনার কব্জিতে, হাতটা সরতে আরম্ভ করেছে, ক্রমেই সরে যাচ্ছে, খসে পড়তে যাচ্ছে ভারি বস্তুটার টানে। মানসচক্ষে দড়িটা, ভারি বস্তুটা (পাথর বা এক কেজি বাটখারা—যা খুশি ভাবতে পারেন), বাঁধনটা দেখুন। মন থেকে অন্যান্য সব চিন্তা দূর করে দিন।

এবার মনে মনে নিজেকে বলুন: 'হাত ভারি লাগছে তোমার, হাতটা অত্যন্ত ভারি হয়ে গেছে। যতবার তুমি মনে মনে "ভারি" কথাটা বলবে ততবারই ভার অনুভব করবে তুমি হাতে, হাতটা সরে যাবে আরও কিনারায়, এই ভাবে সরতে সরতে পড়ে যাবে, নিচে। ভারি…ভারি…ভারি…'

এবার কল্পনা করুন, খড়িমাটি দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে আপনি লিখছেন 'ভারি'। নিজেকে বলুন, 'যতবার তুমি "ভারি" শব্দটি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবে

ততবারই স্পষ্ট ভার অনুভব করবে তুমি হাতে, হাতটা সরে যাবে আরও কিনারায়, এইভাবে সরতে সরতে পড়ে যাবে নিচে।'

বার বার মনে মনে বলুন বা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন। আপনা-আপনি সরতে আরম্ভ করবে হাতটা এবং সত্যি সত্যি পড়ে যাবে নিচে।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য রাখতে হবে—নিজেকে 'তুমি' বলে নির্দেশ দিতে হবে, 'আমি' বলে নয়। ভেবে নিন আপনার চেতন মন অবচেতন মনকে নির্দেশ দিচ্ছে। অনেকে প্রথমবারেই ফল পাবেন, আবার অনেকে কয়েকবার চেষ্টার পর ফল পাবেন। কিন্তু সবাইকেই প্র্যাকটিস করে যেতে হবে সাফল্য বা অসাফল্য যাই আসুক না কেন।

চার

আরাম করে বসে বা শুয়ে একটা হাত এমন জায়গায় রাখুন যাতে আপনি হাতের উল্টো পিঠটা দেখতে পান। হাতের দিকে চেয়ে থাকুন, এবং আঙুলগুলো যতদূর সম্ভব ফাঁক করুন। এবার কল্পনা করুন একটা বৃত্তাকার রবারের ব্যাণ্ড আপনার কনিষ্ঠা থেকে তর্জনী পর্যন্ত চারটে আঙুলে পরানো আছে। রবার ব্যাণ্ডের পরিধি খুব ছোট, আপনি ওর মধ্যে কোনমতে চারটি আঙুল পুরে জোর করে আঙুল ছড়িয়ে ওটাকে আরও বড় করেছেন। স্পষ্ট অনুভব করতে পারছেন আপনি, রবার ব্যাণ্ডটা চারটে আঙুলকে টেনে এক জায়গায় করতে চাইছে। ভাবুন, 'আঙুলগুলো যতই ফাঁক করে রাখার চেষ্টা করো না কেন, তোমার আঙুলগুলো কাছাকাছি চলে আসবেই।'

এবার চোখ বন্ধ করে ফেলুন। সব রকম চিন্তা মন থেকে দূর করে দিয়ে ভাবতে থাকুন আঙুলগুলোকে টেনে একত্র করতে চাইছে রবার ব্যাণ্ড, আপনি চেষ্টা করছেন আঙুলগুলো ফাঁক করে রাখার, কিন্তু পারছেন না। ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে আঙুলগুলো, লেগে যেতে চাইছে একে অপরের সাথে। ভাবুন, 'তোমার চারটে আঙুল একবার এক সাথে হলে কিছুতেই ফাঁক করতে পারবে না তুমি।'

এই দুটো ব্যাপার পর পর অনুভব করুন; (১) আঙুলগুলোকে কিছুতেই ফাঁক রাখা যাচ্ছে না, যতই চেষ্টা করছেন ততই ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন, ততই কাছে চলে আসছে এবং (২) আঙুলগুলো একসাথে হলে, শত চেষ্টা করেও ফাঁক করতে পারবেন না।

আঙুলগুলো এক সাথে হয়ে যাবে আপনার অজান্তেই। যখন টের

পেলেন আঙুলগুলো আর ফাঁক নেই, তখন কল্পনা করুন রবার ব্যাণ্ডটা এখনও খুব জোরে আঁকড়ে ধরে আছে আঙুলগুলোকে ফাঁক করা যাচ্ছে না। চেষ্টা করে দেখুন ফাঁক করা যায় কিনা। না পারলে বুঝবেন সফল হয়েছেন। স্বাভাবিক হওয়ার সাজেশন দিন এবার।

পাঁচ

পরবর্তী প্রক্রিয়ার নাম 'ঢোক গেলা'। এখানে একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখা দরকার বলে মনে করছি, তা হলো, একের পর এক যে প্রক্রিয়াগুলো এই পরিচ্ছেদে দেয়া হচ্ছে সেগুলো নিয়মিত অনুশীলন করে আপনি আত্মসম্মোহন শেখার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত তো করবেনই, সেই সাথে ধাপে ধাপে আত্মসম্মোহনের পথে এগোবেনও। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমেই আপনি ক্রমে সম্মোহিত হয়ে পড়ছেন, প্রক্রিয়াগুলো অনুশীলন করার ব্যাপারে যদি গভীর মনোনিবেশ আরোপ করতে সমর্থ হন। আপনি শুধু যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাই নয়, আত্মসম্মোহন শিখছেনও, সম্মোহিত হচ্ছেনও।

এবার প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে জেনে নিন।

মনে মনে নিজেকে সাজেশন দিতে হবে, দশ পর্যন্ত গুণবেন আপনি ধীরে ধীরে, এই সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড, অদম্য ইচ্ছা হবে ঢোক গেলার, বাধ্য হবেন। সংখ্যা গুণতে শুরু করবেন এরপর আপনি, সাথে এইভাবে সাজেশন দেবেন:

'এক···আমার গলা শুকিয়ে আসছে, প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছে একবার ঢোক গিলি। দুই···অসম্ভব শুকনো লাগছে গলাটা, ভীষণভাবে অনুভব করছি ঢোক গেলার প্রয়োজন। তিন··· আমার গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে, এবং একবার ঢোক গেলার প্রচণ্ড প্রয়োজন অনুভব করছি। চার···এইভাবে নিজেকে সাজেশন দিতে থাকুন, বারবার পুনরাবৃত্তি করুন। দশ পর্যন্ত গোণার পর সত্যি সত্যি একবার ঢোক গিলতে বাধ্য হবেন আপনি।

ছয়

ফুট টেস্ট। বসা বা শোয়া অবস্থায় চর্চা করতে পারেন। ভাবতে হবে, আপনার পা দুটো মেঝের সাথে এমন ভাবে আটকে গেছে বা আপনার পা দুটো এমনই ভারি, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে গুণতে গুণতে নির্দিষ্ট

সংখ্যায় না পৌঁছানো পর্যন্ত সেগুলো উপর দিকে তোলা অসম্ভব। প্রক্রিয়া শুরু করার আগেই আপনি আপনার পা দুটোয় পরিপূর্ণ বিশ্রামের অনুভূতি আনার চেষ্টা করুন। আর নিজেকে নিম্নলিখিত সাজেশন দিন:

'পাঁচ পর্যন্ত গুণলে আমি আমার পা দুটোয় অনুভব করব ভারি, আরামদায়ক একটা অনুভূতি।' অনুভূতিটা অত্যন্ত আরামদায়ক, পরিপূর্ণ বিশ্রামের মত আরামদায়ক হবে। এরপর এক...দুই...তিন...এইভাবে দশ পর্যন্ত গুণবেন। সংখ্যা গোণার মধ্যবর্তী সময় কতটা রাখবেন সেটা নির্ভর করবে আপনার উপর। তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার নেই। পা দুটোয় ভারি, আরামদায়ক অনুভূতি আনার জন্যে প্রচুর সময় নিন। ও দুটো অসম্ভব ভারি এবং পরিপূর্ণ বিশ্রাম লাভ করলে এরপর আপনি কল্পনার চোখে একটা সিনেমার পর্দা দেখার চেষ্টা করবেন, সেই পর্দায় দেখবেন নিজেকে, আপনি শুয়ে বা বসে আছেন। আপনার পা মেঝেতে লেগে রয়েছে বা খাটের উপর লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে। বসা অবস্থায় যদি অনুশীলন করেন, তাহলে মানস-চক্ষে দেখুন আপনার জুতোয় পেরেক গেঁথে আটকে দেয়া হয়েছে পা দুটো মেঝের সাথে। শুয়ে থাকলে দেখুন, খাটের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে পা দুটোকে।

ফুট টেস্টের দ্বিতীয় পর্যায় এবার।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সাজেশন এই রকম হবে:

'দশ পর্যন্ত গুণতে শুরু করার পর আমি অনুভব করব আমার পা দুটোকে উঁচু করা বা উপর দিকে তোলা সম্ভব নয়। কারণ, প্রচণ্ড ভারি হয়ে আছে ওগুলো এবং আটকে গেছে। দশ পর্যন্ত গোণা শেষ হলে চেষ্টা করব ওগুলো উপর দিকে তুলতে, কিন্তু পারব না। এরপর পনেরো পর্যন্ত গুণতে শুরু করব আমি, এবং গোণা শেষ না হলে কোন মতেই তুলতে পারব না।' এরপর এক...দুই...তিন...গুণতে শুরু করুন, প্রয়োজনীয় সাজেশন দেবার ফাঁকে ফাঁকে। সাজেশনের নমুনাও দিচ্ছি এখানে:

'ছয়...অসম্ভব ভারি হয়ে উঠেছে পা দুটো। সাত...পনেরো পর্যন্ত না গুণলে কোনমতেই তুলতে পারব না। আট...বড় আরামদায়ক অনুভূতি উপভোগ করছি পা দুটোতে, ক্রমেই ভারি, আরও ভারি হয়ে উঠছে। নয়...সম্পূর্ণ শরীর পরিপূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ করছে এবং পা দুটো এত ভারি হয়ে রয়েছে যে উপর দিকে তোলা একেবারেই অসম্ভব। দশ পা দুটো নড়ছে না। এতটুকু নাড়তে পারছি না। পনেরো পর্যন্ত না গোণা

'পর্যন্ত এক চুলও নাড়তে পারব না।'

এই পর্যায়ে আপনি সত্যি সত্যি চেষ্টা করবেন আপনার পা দুটোকে নাড়াতে বা উপর দিকে তুলতে। যদি না পারেন, মনে করতে হবে সম্মোহিত হয়েছেন আপনি। মোহতন্দ্রার হালকা স্তরে পৌঁছে গেছেন।

আপনার পরবর্তী উদ্দেশ্য হবে পা দুটোকে নাড়ানো অর্থাৎ আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা। তা আনার জন্যে আপনাকে শুধু বলতে হবে:

'এখন আমি ইচ্ছে করলে পা দুটোকে নাড়তে পারব। এগারো...ভারি অনুভূতিটা দূর হয়ে যাচ্ছে, এবং পনেরো পর্যন্ত গুণলে পা দুটো তুলতে পারব। বারো...অনুভব করতে পারছি ভার কমে যাচ্ছে, অবসাদ দূর হয়ে যাচ্ছে পা-দুটো থেকে। তেরো...পা দুটো নাড়তে শুরু করেছি আমি। চোদ্দ...আরও...আরও উপরে তুলতে পারছি পা দুটোকে। পনেরো...শরীরের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে আমার, পা দুটো আমার ইচ্ছেয় উঠছে, নড়াচড়া করছে।'

যে কোন প্রক্রিয়াই হোক, একবারের চেষ্টাতেই যে পাস করবেন, করতেই হবে, তার কোন মানে নেই। একবার না পারিলে দেখো শতবার—এই নীতি অবলম্বন করতে হবে আপনাকে আত্মসম্মোহন শেখার বা চর্চা করার প্রতিটি পদক্ষেপে।

সাত

সাত নম্বর প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলো, ধীরে ধীরে আপনার হাত উঠে যাবে, উঠে গিয়ে স্পর্শ করবে আপনার চিবুক। এরপর হাতটা আপনি ধীরে ধীরে আবার নামিয়ে আনবেন আপনার পাশে।

প্রথমে ডান হাতটায় আরামদায়ক, পরিপূর্ণ বিশ্রামের অনুভূতি আনার চেষ্টা করুন। অত্যন্ত হালকা, আরামদায়ক একটা অনুভূতি উপভোগ করুন হাতে। এতে সফল হলে নিজেকে এরপর আপনি সাজেশন দেবেন, 'এবার এক থেকে গুনে দশ পর্যন্ত পৌঁছার আগেই আমার ডান হাত উপরের দিকে উঠে এসে স্পর্শ করবে আমার চিবুক। চিবুক ছুঁয়েই হাতটা ফিরে যাবে আগের জায়গায়।' এক একটি করে সংখ্যা গুণবেন এবং পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় সাজেশন দেবেন নিজেকে। তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনার ডান হাত চিবুক স্পর্শ করলে ওটাকে শরীরের পাশে নামিয়ে আনার জন্য নতুন করে প্রয়োজনীয় সাজেশন দিতে হবে। নিজের

মন-মত, সুবিধে অনুযায়ী সাজেশন তৈরি করবেন আপনি। যে শব্দ আপনার পছন্দ সেই শব্দ ব্যবহার করবেন। বাক্যগঠনরীতিও আপনার পছন্দ মত হবে।

আর একটা কথা বলা দরকার। সাজেশন দেবার উপযুক্ত সময়ে সাজেশন দিতে হবে নিজেকে আপনার। তাড়াতাড়ি ফল পাবার জন্যে অধৈর্য হয়ে উপযুক্ত সময়ের আগে সাজেশন দিলে কাজ হবে না। হাতে প্রচুর সময় নিয়ে অধিবেশনে বসুন। কোন প্রক্রিয়া দশ পনেরো মিনিট ধরে অভ্যাস করার পর যদি সফল না হন, সেদিনের মত ক্ষান্ত দিন। পরদিন আবার চেষ্টা করুন নতুন উদ্যমে।

প্রত্যেকদিন নির্দিষ্ট একটা সময় বেছে নিয়ে চর্চা করাটা সব দিক থেকে ভাল। নির্দিষ্ট সময় উতরে গেলে সেদিনের মত ছুটি, আবার পরদিন ওই একই সময় শুরু করুন।

আট

আট নম্বর প্রক্রিয়া বা টেস্ট 'মাছি টেস্ট' নামে পরিচিত। কল্পনায় আপনি দেখবেন একটা মাছি ডান বা বাম হাতের উল্টোপিঠে বসে আছে। মাছিটা কাল্পনিক। তা সত্ত্বেও ওটা আপনার হাতের উল্টোপিঠে হাঁটছে, ওটার অস্তিত্ব আপনি অনুভব করতে পারছেন। কল্পনায় দেখা এবং অস্তিত্ব অনুভব করা সম্ভব হলে মনে করতে হবে হালকা ভাবে সম্মোহিত হয়েছেন আপনি।

সাজেশনের নমুনা:

'দশ পর্যন্ত গুণব আমি, এবং গোণা শেষ হবার আগেই আমার হাতের উল্টোপিঠে একটা মাছি হাঁটছে এই অনুভূতি হবে আমার। মাছিটার অস্তিত্ব পরিষ্কার টের পাব। অনুভব করব ওর স্পর্শ। এক···আমার ডান হাত এখন পরিপূর্ণ বিশ্রাম ভোগ করছে। দুই···সম্পূর্ণ ঢিল করে দিয়েছি আমার শরীর। তিন···হাতটার উল্টোপিঠ সুড়সুড় করছে, চুলকাচ্ছে একটু একটু—স্পষ্ট স্পর্শ বোধ করছি। চার···পরিষ্কার অনুভব করছি একটা মাছি বসে আছে আমার হাতের উল্টোপিঠে। দেখতে পাচ্ছি। পাঁচ···মাছিটা হাঁটছে। ছয়···এদিক ওদিক হাঁটছে, থামছে, আবার হাঁটছে—পরিষ্কার স্পর্শ পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি। সাত···মাছিটার ওজন অনুভব করছি আমি। আট···মাছিটার ওজন প্রকটভাবে অনুভব করতে পারছি এখন

আমি। নয়···হাতটা আমি ঝাড়া দিলেই মাছিটা অদৃশ্য হয়ে যাবে। দশ··· চলে গেছে মাছিটা হাত ঝাড়া দেবার সাথে সাথে।'

নয়

এবার আত্মসম্মোহনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং অত্যন্ত জরুরি একটা পদ্ধতি দেয়া হচ্ছে। পরিপূর্ণ বিশ্রাম লাভের বা শিথিলায়নের জন্যে এটা নিয়মিত চর্চা করা দরকার।

এমন একটা সময় বাছাই করুন যখন তাড়াহুড়ো নেই কোনরকমের। ঘরের মধ্যে কড়া আলো না থাকা এবং হট্টগোল না হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরনে আঁট-সাট জামা কাপড় থাকলে ঢিল করে দিন। গলার টাই, পায়ের জুতো, হাতের ঘড়ি সব খুলে রাখতে হবে।

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন এবার। ছোট একটা বালিশ অথবা মোড়ানো তোয়ালে ঘাড়ের নিচে রাখুন। মাথার নিচে বালিশ থাকবে না, মাথাটা বিছানার উপর শরীরের অন্যান্য অংশের সাথে সমান্তরাল অবস্থায় থাকবে। দুই হাঁটুর নিচে ছোট একটা বালিশ রাখুন। যতটা সম্ভব আরাম করে বিছিয়ে দিতে হবে শরীরটা দেহের ওজন সম পরিমাণে সব জায়গায় ছড়িয়ে দিয়ে।

১। দুই পায়ের আঙুলগুলো ভাঁজ করে যতদূর সম্ভব বাঁকিয়ে রাখুন কয়েক সেকেণ্ড, তারপর ঢিল করে দিয়ে অন্তত দশ সেকেণ্ড ভাবুন যেন অবশ হয়ে গেছে আঙুলগুলো। ২। এবার পায়ের আঙুলগুলো উপর দিকে রেখে পায়ের কব্জি এমনভাবে বাঁকান যাতে আঙুলগুলো আপনার মাথার দিকে ফেরানো থাকে। যতদূর সম্ভব বাঁকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড মাংসপেশীর টান অনুভব করুন, তারপর সম্পূর্ণ শিথিল করে দিন। ৩। পায়ের আঙুলগুলোর উপর দিকে রেখে পায়ের কব্জি এমন ভাবে বাঁকান যাতে আপনার মাথা যেদিকে আছে আঙুলগুলো তার উল্টো দিকে ফেরানো থাকে। গতদূর সম্ভব বাঁকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড মাংসপেশীর টান অনুভব করুন, পায়ের গোছা ও ঊরুর মাংসপেশীগুলো শক্ত করুন। তারপর ঢিল দিন। কল্পনা করুন যেন নেতিয়ে পড়ছে পা-টা ঠিক যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। ৪। নিতম্বের মাংসপেশীগুলোও এই একই ভাবে শক্ত এবং ঢিল করুন। ৫। এরপর লম্বা করে দম নিন, পিঠটা খানিকটা বাঁকা করে মাংসপেশীর টান অনুভব করুন। কয়েক সেকেণ্ড দমটা ধরে রেখে নিঃশ্বাস ফেলুন, সেই সাথে এলিয়ে দিন শরীরটা। পিঠ না বাঁকিয়ে

এটা আরেকবার করুন। ৬। এরপর কাঁধ ও পিঠের পেশী টান করুন। দুই কাঁধ যতটা সম্ভব উপর দিকে তুলে, কয়েক সেকেণ্ড রেখে আলগা করে দিন। ৭। দুই হাত সোজা ছাতের দিকে তুলুন আঙুলগুলো সোজা রেখে, আরও উঁচু করার চেষ্টা করুন, ধীরে ধীরে শক্ত মুঠি পাকান এবং কনুই ভাঁজ করে খুব ধীরে ধীরে হাতের মুঠি নামিয়ে আনুন কাঁধের কাছে। হাতের প্রতিটি পেশীতে যেন টান পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কয়েক সেকেণ্ড এভাবে রেখে হাত দুটো আলতোভাবে পড়ে যেতে দিন বিছানার উপর, যেন হাত দুটো কাদার তৈরি। ৮। এবার মাথাটা তুলে সামনের দিকে বাড়ান যতক্ষণ না চিবুক আপনার বুক স্পর্শ করছে, ঘাড়ের পেশীগুলো টান করুন, মুখটা ধীরে ধীরে তিন চারবার এপাশ-ওপাশ ফেরান ঘাড়ের পেশীর টান বজায় রেখেই, তারপর মাথাটা এলিয়ে পড়ুক আগের জায়গায়। ৯। এরপর যত জোরে পারা যায় দুই চোখ বন্ধ করুন, কয়েক সেকেণ্ড পর আলগা করে দিন। ১০। মুখ হাঁ করে চোয়ালটা এপাশ ওপাশ ফেরান যতদূর যায়, ঢিল করুন। এবং ১১। সবশেষে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বেলুন ফোলানোর মত করে গাল ফুলান, পাঁচ সেকেণ্ড এই অবস্থায় থেকে ঢিল করুন।

যখনই ঢিল করছেন পরিপূর্ণ বিশ্রামের কথা কল্পনা করার চেষ্টা করুন, প্রত্যেকটা পেশী ঢিল করে দিন, নেতিয়ে পড়ুক আপনার শরীরটা বাতাস ছেড়ে দেয়া সাইকেলের চাকার মত।

অভ্যাসের সময় শারীরিকভাবে একবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চর্চা করার পর কমপক্ষে তিন-চারবার মনে মনে চর্চা করতে হবে।

এই নয়টি প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে চর্চা করতে হবে আপনাকে। আত্মসম্মোহনের প্রস্তুতি পর্ব এটা, সুতরাং সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক মাস এই নয়টি প্রক্রিয়া নিয়মিত চর্চা করুন, আত্মসম্মোহনের তিন ভাগের দুই ভাগ শেখা হয়ে যাবে আপনার। প্রস্তুতি পর্বের এখানেই সমাপ্তি। আগামী পরিচ্ছেদে আত্মসম্মোহনের গভীর স্তরে যাওয়ার নিয়ম ও প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

এমন একটা সময় বাছাই করুন যখন তাড়াহুড়ো নেই, এমন একটা নির্জন জায়গা বাছাই করে নিন যেখানে হট্টোগোল নেই। নিয়েছেন? এবার শুয়ে পড়ুন বিছানায়, কিংবা বসুন কোন গদি আঁটা চেয়ারে। পরনে আঁটো কাপড়চোপড়, বেল্ট বা টাই থাকলে ঢিল করে দিন। নড়েচড়ে শরীরটাকে এমন ভাবে স্থাপন করুন যাতে সবচেয়ে বেশি আরাম হয়, কোথাও অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। পায়ের উপর পা তুলবেন না, কিংবা দুই হাতে বুক বাঁধবেন না।

সহজ ভঙ্গিতে সামনের দিকে সোজাসুজি চাইলে যে জায়গাটার উপর চোখ পড়ে তার খানিকটা উপরে একটা জায়গা বেছে নিয়ে দৃষ্টি স্থাপন করুন। নেহায়েত প্রয়োজন হলে পলক ফেলতে পারেন, কিন্তু চোখের দৃষ্টি যেন একটুও এদিক ওদিক না নড়ে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

এর আগের পরিচ্ছেদে যে নয়টি প্রক্রিয়া আপনি অনুশীলন করেছেন সেগুলোর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি হয়েছে আপনার, কোন কোন প্রক্রিয়ার সাহায্যে সম্মোহিতও হয়েছেন। এই পরিচ্ছেদে আপনাকে সরাসরি সম্মোহিত হওয়া শেখানো হচ্ছে। প্রতিটি প্রক্রিয়া চর্চা বা অনুশীলন করতে হবে আপনাকে। কিন্তু সবার আগে দরকার সাফল্য আসবেই এ-রকম একটা মনোভাব। চর্চা শুরু করার আগে ভাল মত পড়ে বুঝে প্রায় মুখস্থ করে নিতে হবে প্রক্রিয়াগুলো, যাতে চর্চার সময় ভুল না হয়, কিংবা বইয়ের পাতা উল্টাতে না হয়।

আত্মসম্মোহনের নয়টি ধাপ আছে:

এক

মোহতন্দ্রা (hypnotic trance) থেকে ঠিক কখন জেগে উঠতে চান মনে মনে ঠিক করে নিন। ধরুন, এখন বাজে রাত নয়টা, আপনি আধ ঘণ্টা সম্মোহিত থাকতে চান। কথাটা বার কয়েক মনে মনে

বলুন। ঘড়ির কাঁটা দুটো এখন ঠিক কি অবস্থায় আছে কল্পনা করুন, আধঘণ্টা পর কি অবস্থায় যাবে কল্পনা করুন। মনে মনে কয়েকবার বলুন, 'আধঘণ্টা পর মোহতন্দ্রা ছুটে যাবে তোমার। ঠিক সাড়ে নয়টায় জেগে উঠবে তুমি। ঘড়ির কাঁটা যখন—(সাড়ে নয়টার সময় কাঁটা দুটো কি অবস্থায় থাকবে কল্পনা করুন) এই অবস্থায় আসবে অমনি জেগে যাবে তুমি।' ইত্যাদি। ঠিক এই কথাগুলোই বলতে হবে এমন নয়, আপনার ইচ্ছে মত বানিয়ে বলুন। মোটকথা, যেভাবে পারেন, তিরিশ মিনিট আধঘণ্টা বা সাড়ে ন'টা, যেমনভাবে আপনার খুশি নিজেকে বোঝান ঠিক কখন জেগে উঠতে চান। কিছুদিন চর্চার পর নিজেই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করবেন যে ঠিক সময় মত ছুটে যাচ্ছে আপনার মোহতন্দ্রা। আর একটা কথা, লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই, নিজেকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করা হচ্ছে। যেন আপনার চেতন মন অবচেতন মনের সাথে কথা বলছে, নির্দেশ দিচ্ছে, এমনি ভাবে বলতে হবে সব কথা।

দুই

ঠিক কখন জেগে উঠতে চান সেটা ভাবতে আধ মিনিট বা এক মিনিটের বেশি সময় ব্যয় করার দরকার নেই। সময়টা ঠিক করে নিয়ে আপনার নিজের কাছে নিজের বক্তব্যটা (hypnotic suggestion) বারকয়েক মনে মনে আওড়ে নিন। বক্তব্যটা যত স্পষ্টভাবে নিজেকে উপলব্ধি করাতে পারেন ততই ভাল। সম্ভব হলে স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলুন, যদি কোন ভয় দূর করতে চান তাহলে শব্দ বা বাক্যে যা বলবার তা তো বলবেনই, সেই সাথে নিজেকে সাহসী হিসেবে কল্পনা করুন, নিজের সাহসী কার্যকলাপ, আচার-ব্যবহার সিনেমার মত প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করুন, কল্পনায় নিজেকে দেখুন, মুখে রয়েছে আপনার আত্মবিশ্বাসের মৃদু হাসি।

ধরুন, প্রথমে এক-দু'মাস আত্মসম্মোহনের শিক্ষাটা ত্বরান্বিত এবং আত্মবিশ্বাস অর্জন করাই আপনার উদ্দেশ্য। তাই আপনার বক্তব্য বা হিপনোটিক সাজেশন হবে. 'আগের চেয়ে আরও অনেক গভীরভাবে সম্মোহিত হবে তুমি আজ। সম্মোহনের অনেক গভীর স্তরে পৌঁছুবে তুমি আজ অল্প সময়েই।' কিংবা, 'আত্মবিশ্বাস আসবে তোমার মধ্যে প্রচণ্ড ভাবে। যে কাজে হাত দেবে তাই করতে পারবে তুমি। মোহতন্দ্রা থেকে জেগে উঠেই অপূর্ব এক সুন্দর অনুভূতিতে ছেয়ে যাবে তোমার

মন।' মনে রাখবেন, আপনার বক্তব্যের গভীর স্পষ্ট ছাপ ফেলতে হবে মনের উপর, হালকাভাবে চলবে না, গভীর ভাবে ভাবতে হবে বক্তব্যটা।

তিন

প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপ পেরোতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পলকহীন ভাবে একদিকে চেয়ে রয়েছেন আপনি, চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে আপনার। 'ঘুম', 'তন্দ্রা', এই ধরনের কোন একটি শব্দ বেছে নিয়ে বার বার উচ্চারণ করতে থাকুন মনে মনে। কল্পনা করুন, বুজে আসতে চাইছে চোখের পাতা, ভারি হয়ে নেমে আসতে চাইছে নিচে, কিছুতেই খোলা রাখতে পারছেন না আপনি, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চোখ দুটো।

[কোন একটি শব্দ বেছে নিয়ে বার বার উচ্চারণ করতে কেন বলা হচ্ছে সেটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। প্রতিদিন খাওয়ার আগে ঘণ্টা বাজানোর ফলে রুশ ফিজিওলজিস্ট ড. ইভান পাভলভের কুকুর যেমন ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে খাবারের কল্পনাকে যুক্ত করে নিয়েছিল, ঘণ্টা বাজলেই জিভে পানি এসে পড়ত তার, তেমনি মানুষও ইচ্ছে করলে কোন একটি শব্দের সাথে কোন একটি ভাব বা অবস্থাকে যুক্ত করে নিতে পারে।

যেমন ধরুন, 'লতুতেঁ' শব্দটি শুনলে বা পড়লে আমাদের বিশেষ কোন ভাবোদ্রেক হয় না। কিন্তু অক্ষরগুলো উল্টে দিয়ে যদি 'তেঁতুল' বলা যায় অমনি শব্দটি আমাদের উপর এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। শব্দটা আমরা চিনি, শব্দটির সাথে তেঁতুলের কিছু দ্রব্য-গুণ যুক্ত করে রেখেছি আগে থেকেই। তেঁতুলের আকার, স্বাদ, সেই সাথে একটু লবণ কল্পনা করলেই আমাদের মুখে পানি আসছে। এটা ঘটছে পূর্ব-পরিচিতির জন্যে। তেমনি ঘুম বা তন্দ্রা, বন্ধ, বিশ্রাম বা আরাম, শান্তি বা আনন্দ, মোহ বা আবেশ ইত্যাদি শব্দের সাথে যুক্ত করে নিতে চাই আমাদের কিছু অবস্থা বা ভাব। যাতে শব্দগুলো উচ্চারণ করলেই প্রত্যাশিত ভাব বা অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে পারি।]

চার

চোখ বন্ধ হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে 'বন্ধ' শব্দটি বার বার মনে মনে উচ্চারণ করুন, এবং কল্পনা করুন, চোখের পাতা ভারি হয়ে বুজে যাচ্ছে। বিশ্বাস করার চেষ্টা করুন, নির্ধারিত সময়ের আগে শত চেষ্টা করেও চোখ খুলতে পারবেন না আপনি (অবশ্য এটাও সাথে সাথে বলা

দরকার যে, যদি হঠাৎ কোন বিপদ-আপদ উপস্থিত হয় তাহলে ঠিকই টের পাবেন আপনি, বরং সম্পূর্ণ সজাগ মানুষের চাইতে আগেই টের পাবেন, এবং মুহূর্তে সজাগ হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন)। চোখ যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন পরবর্তী পর্যায়ে চলে আসুন।

পাঁচ

পরিপূর্ণ বিশ্রামের পদ্ধতি এর আগের পরিচ্ছেদে পেয়েছেন, চর্চা করে ইতিমধ্যেই সেটা রপ্ত করে নিয়েছেন নিশ্চয়ই। এইবার সেটাকে ব্যবহার করতে হবে। আগেই বলেছি এক এক করে শরীরের প্রত্যেকটি পেশী টান করে বাতাস ছেড়ে দেয়া সাইকেলের চাকার মত ঢিল করে দিতে হবে, সেই সাথে পরিপূর্ণ বিশ্রামের অনুভূতি কল্পনা করতে হবে। এবার তার সাথে 'শিথিল' 'আরাম' বা এই ধরনের কোন শব্দ যুক্ত করে নিন। যখনই পেশী ঢিল করছেন তখনই মনে মনে বারবার উচ্চারণ করুন শব্দটি, পরিপূর্ণ বিশ্রামের সঙ্গে শব্দটিকে এমন ভাবে যুক্ত করে ফেলুন যাতে প্রয়োজনের সময় কেবল শব্দটি উচ্চারণ করলেই পরিপূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় পৌঁছে যেতে পারেন কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।

চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরই 'শিথিল' বা 'আরাম' যে-কোন একটা শব্দ কয়েকবার উচ্চারণ করে সারা শরীর ঢিল করে দিয়ে বিশ্রামাবস্থা লাভ করুন। ইচ্ছে করলে মনে মনে বা সত্যি সত্যি আগাগোড়া শিথিলায়নের প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করতে পারেন এই পর্যায়ে এসে। এতে আরও গভীর বিশ্রাম লাভ করতে পারবেন।

ছয়

এবার মানসিক বিশ্রাম। আপনার শরীরটা যখন পরিপূর্ণ বিশ্রাম লাভ করছে তখনই কেবল আপনার মানসিক বিশ্রাম সম্ভব। 'শান্তি', 'আনন্দ' বা এই জাতীয় কোন শব্দকে এই অবস্থার সাথে যুক্ত করে নিন। ভয়, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে, বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাইরে এক সুন্দর আনন্দময় জগতে নিয়ে যেতে চাইছেন এখন আপনি আপনার মনকে। আপনার জীবনের কোন সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে পারেন। অতুলনীয় কোন সূর্যাস্ত, অপরূপ কোন চাঁদের রাত, উদাস করা কোন শীতের দুপুর—যা খুশি। সেই সাথে যুক্ত করে নিন 'শান্তি', 'আনন্দ' বা আর কোন শব্দ, যেন শব্দটি মনে মনে উচ্চারণ করলেই মনটা সেই সুন্দর

জগতে চলে যায়। বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং আশপাশের শব্দ সম্পর্কে সচেতনতা কমে আসছে আপনার। ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন আপনি।

ইতোমধ্যেই আপনি কিন্তু হালকা স্তরে পৌঁছে গেছেন। অনেকে টের পায়, অনেকে পায় না। কিন্তু সম্মোহন কাজ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে এই পর্যায়ে।

সাত

'মোহ', 'আবেশ' বা এই জাতীয় কোন শব্দ যুক্ত করুন আপনার এখনকার অবস্থার সাথে। সচেতনতা বেশ অনেকটা লোপ পেয়েছে এই অবস্থায়। আপনার অচেতন বা অবচেতন মন এখন আপনার সাজেশন গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কয়েকবার শব্দটি উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট।

আট

আরও গভীর স্তরে চলেছেন এবার আপনি। কল্পনা করুন একটা কালো বোর্ডের উপর সাদা খড়িমাটি (চক) দিয়ে আপনি বড়সড় গোল এক বৃত্ত আঁকলেন। যতটা সম্ভব স্পষ্ট দেখতে পাবার চেষ্টা করুন বৃত্তটা। এবার বৃত্তটার মধ্যে 'X' চিহ্নটি এমন ভাবে আঁকুন যেন বৃত্তের গায়ে স্পর্শ করে চিহ্নটির চারটে প্রান্ত। এবার খুব সাবধানে 'X' চিহ্নটি মুছে ফেলুন। বৃত্তটি যেন মুছে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখবেন। বার কয়েক এভাবে চিহ্নটি এঁকে মুছে ফেললেই অনেক গভীরে চলে যাবেন।

নয়

আরও গভীরে যেতে হলে 'X' চিহ্নটি আর না লিখে বৃত্তটির মধ্যে এবার লিখুন 'A' অক্ষরটি। সাবধানে অক্ষরটি মুছে ফেলে কালো বোর্ডের একপাশে লিখুন 'আরও গভীর'। কল্পনা করুন আরও গভীর স্তরে চলে যাচ্ছেন আপনি। শেষের লেখাটি না মুছে বৃত্তের মধ্যে এবার 'B' লিখুন, সাবধানে মুছে 'আরও গভীর' লেখাটির নিচে আবার লিখুন 'আরও গভীর'। কল্পনা করুন আরও গভীর স্তরে চলে যাচ্ছেন আপনি···এইভাবে ABCD করে এগিয়ে যেতে থাকুন যতদূর পারেন।

চর্চা করতে গেলেই লক্ষ করবেন কিছুদূর গিয়েই ভুলভাল, উল্টোপাল্টা লিখতে আরম্ভ করেছেন আপনি, 'F'-এর পরে হয়তো

লিখেছেন 'I'. কিংবা পরপর দুই তিনবার 'J' লিখে চলেছেন, পরের অক্ষরটি কি হবে ভেবে বের করতে কষ্ট হচ্ছে। লক্ষণটা ভাল। এর মানে আপনি ক্রমেই গভীরতর স্তরে চলে যাচ্ছেন, আবছা হয়ে আসছে আপনার সচেতন মন। আত্মসম্মোহনের গভীর স্তরে পৌঁছুতে সাফল্য অর্জন করেছেন আপনি। অক্ষরগুলো নিয়ে বেশি যুদ্ধ না করে ভুল আরম্ভ হলে হাল ছেড়ে দেয়াই ভাল। যত বেশি অভ্যাস করবেন ততই দেখবেন কমে আসছে অক্ষর লেখা, বেশি দূর এগোতে পারছেন না। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াবে যে অক্ষর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবেন না, বার কয়েক 'X' লিখে মুছে ফেললেই গভীর স্তরে পৌঁছে যাবেন আপনি।

সম্মোহিত হওয়ার সহজ উপায়

আগেই বলেছি, আত্মসম্মোহন শেখার সবচেয়ে সহজ নিয়ম হচ্ছে প্রথমে আর কারও দ্বারা সম্মোহিত হওয়া। সাধারণত এইভাবে কয়েক বৈঠকেই শিখে নেয়া যায় আত্মসম্মোহন, কারও কারও বেলায় এক বৈঠকই যথেষ্ট হয়।

কিন্তু ধারে-কাছে তেমন সম্মোহনকারী সচরাচর না-ও পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে হয় এই বইয়ে দেয়া প্রক্রিয়া এবং নিয়ম-কানুনগুলো নিজে নিজে চর্চা এবং অনুশীলন করে শিখতে হবে আপনাকে, নয়তো টেপ রেকর্ডার বা বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নিয়ে এটা শিখতে হবে।

একা যদি শিখতে চান তাহলে আপনার একটা টেপ রেকর্ডার লাগবে। এই পরিচ্ছেদে আত্মসম্মোহিত হওয়ার জন্যে যে সাজেশন রয়েছে সেটা রেকর্ড করে নিতে হবে। টেপ রেকর্ডারের বদলে কোন আত্মীয় বা বন্ধুকে দিয়ে লেখাটা পড়ালেও কাজ হবে।

আত্মসম্মোহন শিক্ষার জন্যে যে কথাগুলো দেয়া হচ্ছে সেগুলো রেকর্ড করার আগে স্পষ্ট উচ্চারণে অন্তত বার তিনেক জোরে জোরে পড়ুন। এর ফলে রেকর্ডিংটা ভাল হবে। কণ্ঠস্বরটা যেন বেশি ওঠা-নামা না করে সেদিকে লক্ষ রাখবেন—মোটামুটি একঘেয়ে একটানা একটা

ভাব বজায় রাখলে সম্মোহনের জন্যে সুবিধে হবে। বার দুয়েক পড়বার পরই দেখবেন ধীর একটা ছন্দ পেয়ে গেছেন। সেটাই বজায় রাখুন। নিজে রেকর্ড করায় খুব অসুবিধে বোধ করলে কোন বন্ধুকে ডেকে পড়িয়ে নিন তাকে দিয়ে।

আপনার সুযোগ সুবিধে থাকলে কথাগুলোর সাথে সাথে ধীর লয়ের কোন ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকও ব্যবহার করতে পারেন, তবে লক্ষ রাখবেন বাজনাটা যেন খুব আস্তে বাজে, কথাগুলোই মুখ্য, বাজনাটা গৌণ।

রেকর্ডটা শোনার জন্যে এমন একটা স্থান ও কাল বাছাই করুন যে সময়ে বা যেখানে কোনরকম বাধা পড়বে না। আরাম করে আরাম-কেদারায় বসুন বা বিছানায় শুয়ে পড়ুন। জামাকাপড় ঢিল করে দিন। এবার স্থির দৃষ্টিতে তাকান কোন নির্ধারিত বিন্দুর দিকে। স্বাভাবিক ভাবে চাইলে চোখটা যেখানে পড়ে তার চেয়ে খানিক উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এইবার টেপ রেকর্ডার চালু করে দিন। কিংবা আঙুলের ইশারায় বন্ধুকে বলুন পড়া শুরু করতে। আপনার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন পাঠরত কণ্ঠস্বরের উপর। যা যা করতে বলা হচ্ছে করুন।

রেকর্ডের বিষয়বস্তু

কিছুক্ষণের মধ্যেই আশ্চর্য শিথিল এক আরামের আবেশ আসবে তোমার মধ্যে। জীবনে এত আরামের বিশ্রাম-উপলব্ধি খুব কমই হয়েছে তোমার। শরীর-মন যতই ঢিল করে দেবে, যতই শিথিল করে দেবে, ততই বেশি হবে আরাম। যেখানটায় তাকিয়ে আছ, আরও কিছুক্ষণ চেয়ে থাকো সেদিকেই। লম্বা করে দম নাও একটা। তারপর ধীরে ধীরে বাতাস বের করে দাও ফুসফুস থেকে। সব বাতাস বের করে দাও। এবার আরেকটা লম্বা শ্বাস টানো। আবার খালি করো ফুসফুস। হ্যাঁ, এই রকম। সব বাতাস বের করে দিয়ে আবার একটা দম নাও আগের মত। এবার স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকুক শ্বাস-প্রশ্বাস। প্রতিটি শ্বাসের সাথে সাথে আরও শিথিল হচ্ছে তোমার শরীরের সমস্ত পেশী। যা বলা হচ্ছে মন দিয়ে শোনো। অন্য কোন দিকে চিত্ত বিক্ষেপ না করে এক মনে শুনে

যাও কথাগুলো। শরীর-মন শিথিল করে দাও আরও, আর শোনো।

চোখের পাতা দুটো একটু কাঁপছে হয়তো তোমার। চোখের পলক ফেলতে ইচ্ছে করলে ফেলতে পারো, তবে দৃষ্টিটা যেদিকে স্থির হয়ে আছে সেদিকেই থাকুক আরও কিছুক্ষণ। হয়তো লক্ষ করছ, চোখের পাতাগুলো একটু ভারি হয়ে আসতে শুরু করেছে। ক্রমে আরও ভারি মনে হবে ওগুলো, খুলে রাখা কষ্টকর হয়ে উঠবে ক্রমে। বেশ ভারি লাগছে এখন। খানিক বাদেই বুজে আসতে চাইবে পাতা দুটো। বুজে আসতে চাইলে যে-কোন সময় চোখ বুজতে পারো। একটু পর ওগুলো এতই ভারি মনে হবে যে খুলে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে, এবং আপনা থেকেই বুজে যাবে। এবার বুক ভরে আর একটা দম নিয়ে ছেড়ে দাও, আরও শিথিল করে দাও নিজেকে। নিজেকে ধরে না রেখে ছেড়ে দাও, ঢিল করে দাও, শরীর মন।

আরামের আবেশ আসবে তোমার মধ্যে খানিক বাদেই। চমৎকার একটা ঘুম ঘুম মোহের আবেশ। হয়তো ইতিমধ্যেই লক্ষ করেছ, আসতে শুরু করেছে স্বপ্নিল একটা আচ্ছন্নভাব। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা সব দূর হয়ে যাচ্ছে তোমার মন থেকে। কোন কিছুরই তেমন গুরুত্ব নেই, যেন কিছুতেই কিছু যায় আসে না, এমনি একটা ভাব আসছে তোমার মধ্যে। একটা 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব। চোখের পাতা দুটো হয়তো আরও বেশি কাঁপছে তোমার। যদি এখনও বুজে গিয়ে না থাকে বুজে যাক ও-দুটো। চোখ বন্ধ করো। পাতাগুলো খুব ভারি লাগছে, খু-উ-ব ভারি। চোখ বুজে মন দিয়ে শোনো কথাগুলো।

হয়তো অনুভব করতে পারছ হাত-পাগুলোও ভারি হয়ে এসেছে তোমার। স্বপ্নিল আচ্ছন্ন ভাবটা বাড়ছে আরও। অদ্ভুত আরামের আবেশ আসছে। শরীরের সমস্ত পেশীগুলোকে আরও ঢিল করে দিতে হবে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিটি পেশী শিথিল করে দিতে হবে। একে একে ঢিল করে দাও সব।

প্রথমে ডান পা থেকে শুরু করা যাক। ডান পায়ের সমস্ত পেশী শক্ত করে ফেলো। খুব শক্ত। এইবার হঠাৎ ঢিল দাও। হ্যাঁ। পায়ের পাতা থেকে কোমর পর্যন্ত সমস্ত পেশী শিথিল হয়ে গেল। ডান পা ঢিল হয়ে গেল কোমর পর্যন্ত।

এবার বাম পা শক্ত করে ফেলো। আরও শক্ত। হঠাৎ ঢিল দাও। হ্যাঁ। শরীরের নিচের অংশ সম্পূর্ণ শিথিল হয়ে গেল। এবার তোমার

তলপেটের পেশীগুলোও শিথিল করো। তারপর বুক। আবার একবার বুক ভরে শ্বাস্ নিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলো। এর ফলে সারা শরীর আরও শিথিল হয়ে আসবে। ভেরি গুড। এবার পিঠের পেশীগুলো ঢিল দাও। কাঁধ আর ঘাড়ে কি একটু আড়ষ্টতা রয়ে গেছে? ঢিল দাও, শিথিল করে দাও এবার হাত দুটো। ডানহাতের সমস্ত পেশী শক্ত করো, হঠাৎ ঢিল দাও। এবার বাম হাত। শক্ত করে হঠাৎ ঢিল দাও। কাঁধ থেকে নিয়ে আঙুলের ডগা পর্যন্ত শিথিল হয়ে গেছে হাত দুটো। আ···হ্! আরা···ম! চমৎকার লাগছে।

সারা মুখে অসংখ্য ছোট ছোট পেশী আছে, সেগুলোও ঢিল করে দাও এবার। গাল, চোয়াল, চোখ, কপাল—সব ঢিল হয়ে গেল। পরিপূর্ণ বিশ্রাম। সারা শরীর শিথিল হয়ে গেছে তোমার। আরাম লাগছে। মনের সব বাঁধন খুলে গেছে। উদ্বেগহীন, স্বপ্নিল বিশ্রামের রাজ্যে চলে গেছ তুমি। ঝির ঝির, ঝির ঝির শান্তির পরশ লাগছে তোমার গায়ে। আরও গভীর আরামের মধ্যে চলে যাচ্ছ তুমি ক্রমে। দিবাস্বপ্নে বহুবার যেমন কল্পনায় ভর করে অন্য এক জগতে চলে গেছ, ইচ্ছে করলেই তেমনি এক জগতে চলে যাওয়া শিখছ তুমি এখন। শিখে একে অনেক কাজে ব্যবহার করবে তুমি, উপকৃত হবে।

শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হয়েছ তুমি।

সম্মোহন আর কিছুই নয়, তুমি এখন যে অবস্থায় আছ, একেই বলে সম্মোহন।

এবার খানিকটা কল্পনার সাহায্য নিতে হবে তোমাকে। কল্পনা করে নাও একটা লম্বা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছ তুমি। সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ সিঁড়ির ধাপগুলো—নেমে গেছে নিচে। রেলিংটা দেখতে পাচ্ছ স্পষ্ট। আমি দশ থেকে শূন্য পর্যন্ত গুনব এখন। আমি গুনতে শুরু করলেই তুমি কল্পনায় ধাপের পর ধাপ নামতে শুরু করবে সিঁড়ি বেয়ে। আমি যখন শূন্য গুনব তখন তুমি নেমে গেছ নিচে। নেমে যাওয়ার ছবিটা স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলবে তুমি কল্পনায়। আমার প্রত্যেকটি গণনা তোমাকে আরও গভীর স্তরে নিয়ে যাবে। প্রত্যেকটি সংখ্যা উচ্চারণের সাথে সাথে গভীর থেকে গভীরতর স্তরে চলে যাবে তুমি। প্রতিটি ধাপ নামার সাথে সাথে আরও···আরও গভীরে তলিয়ে যাবে।

দশ। নামতে শুরু করছ তুমি। প্রতিটা সংখ্যা উচ্চারণের সাথে সাথে আরও গভীরে চলে যাও। নয়···আট···সাত···ছয়। অনেক গভীরে চলে

যাচ্ছ তুমি। আরও···আরও গভীরে। পাঁচ···চার···তিন···দুই। আরও গভীরে। এক···শূন্য। নিচে পৌঁছে গেছ তুমি, পৌঁছে গেছ অনেক গভীরে। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে সাথে চলে যাচ্ছ আরও গভীরে।

শ্বাস-প্রশ্বাসটা হয়তো লক্ষ করেছ। বেশ অনেক ধীরে ধীরে বইছে এখন। আগের চেয়ে বেশ অনেক গভীর ভাবে বইছে শ্বাস—অনেকটা ঘুমন্ত মানুষের মত। শান্ত একটা আরাম, একটা আয়েশের ভাব এসে গেছে তোমার মধ্যে। দেহমনের সব বাঁধন আরও আলগা করে দাও···ডুবে যাও আরও গভীরে। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে সাথে গভীর থেকে আরও গভীরে।

তুমি এখন সম্মোহিত বিশ্রাম উপভোগ করছ। শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হয়েছ।

তোমার হাত দুটোর দিকে খেয়াল করো। খুব সম্ভব বেশ ভারি ঠেকছে ওগুলো তোমার কাছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ ভারমুক্ত হয়ে যাবে তোমার ডান হাতটা। পুরোটা হাত হালকা হতে শুরু করবে। অনুভব করতে পারবে, ওজন চলে যাচ্ছে ওটার। কল্পনায় নিজের ডান হাতটা দেখো। আঙুলের নখ দিয়ে যেন বেরিয়ে যাচ্ছে সব ওজন। অনুভব করতে পারছ, ক্রমে হালকা হয়ে আসছে হাতটা। একটু পরেই পুরোটা হাত ওজনশূন্য হয়ে যাবে। পালকের মত হালকা হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে শূন্যে উঠতে শুরু করবে হাতটা। যেন হাওয়ায় ভেসে উপরে উঠতে থাকবে তোমার ডান হাত, এগিয়ে আসবে মুখের দিকে। আরও হালকা হয়ে আসছে হাতটা। উপরে উঠতে চাইছে। গ্যাস বেলুনের মত হালকা হয়ে গেছে ডান হাতটা। এক্ষুণি অনুভব করতে পারবে শূন্যে ভেসে উঠছে সেটা। হয়তো ইতিমধ্যেই ভেসে উঠতে শুরু করেছে। আরও উপরে উঠবে হাতটা···আরও। কল্পনার চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ, ভেসে উঠছে, ক্রমে এগিয়ে আসছে হাতটা তোমার মুখের কাছে। স্পর্শ না করা পর্যন্ত চলতে থাকবে হাতটা মুখের দিকে।

কনুইয়ের কাছে ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে হাতটা। আরও উপরে উঠছে। যদি এখনও হাতটা শূন্যে ভেসে উঠতে আরম্ভ না করে থাকে, কয়েক ইঞ্চি শূন্যে তোলো ওটাকে, সামান্য একটু ভাঁজ করো কনুই। বাধা না দিয়ে ওটাকে মুখের কাছে নিয়ে আসার ভার ছেড়ে দাও তোমার অবচেতন মনের উপর। আপনিই উঠে আসবে হাতটা, তোমার মুখের কোন অংশ স্পর্শ করে ফিরে যাবে নিজের জায়গায়। প্রথম দিকে একটু

ঝাঁকি অনুভব করবে, তারপর সহজ ভঙ্গিতে উঠে এসে স্পর্শ করবে মুখের কোথাও। আরও একটু উঠুক হাতটা।

হাওয়ায় ভেসে উপরে উঠে আসছে তোমার হাত। উপরে উঠছে। আরও উপরে। এইভাবে উঠতে উঠতে মুখের কোন একটা জায়গায় স্পর্শ করবে হাতটা। আরও উঠে আসছে হাত। আরও। এবার আগের চেয়ে একটু দ্রুত উঠছে। এগিয়ে আসছে। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছ তুমি, এগিয়ে আসছে হাতটা। আরও। যতক্ষণ না মুখ স্পর্শ করছে ততক্ষণ উঠতেই থাকবে হাতটা। হাতটা যত উপরে উঠছে, ততই গভীরে চলে যাচ্ছ তুমি। যতই গভীরে চলে যাচ্ছ, ততই উপরে উঠছে হাত। মুখ স্পর্শ করবার সাথে সাথেই আরও অনেক গভীরে চলে যাবে তুমি। গভীর আরামের আবেশে আচ্ছন্ন হবে।

মুখ স্পর্শ না করা পর্যন্ত হাতটা উপরে উঠবে। স্পর্শ করার পর ফিরে যাবে নিজের জায়গায়। আরও গভীর স্তরে চলে যাচ্ছ তুমি। যেতে থাকো। এই আরামের বিশ্রাম উপভোগ করছ তুমি। প্রতিটা নিঃশ্বাসের সাথে সাথে চলে যাচ্ছ গভীর থেকে গভীরতর স্তরে। এক্ষুণি হাতের স্পর্শ পাবে তুমি তোমার মুখের কোন অংশে। তখন হাতটা নামিয়ে ফেলতে পারো।

প্রত্যেকটা কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি। সবকিছু সম্পর্কেই সজাগ আছ। আরও খানিকটা ঢিল দাও, আরও খানিক গভীরে চলে যাও। যতই গভীরে যাবে ততই বেশি আরাম লাগবে। কেমন একটা ঘুম ঘুম আচ্ছন্ন ভাব অনুভব করছ তুমি এখন নিজের ভেতর। যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না। সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সরে গেছে বহুদূরে। কোন কিছুতেই কিছুই এসে যায় না এখন তোমার। পরিপূর্ণ বিশ্রামের আরাম ঘিরে রেখেছে তোমাকে।

এই কথাগুলো যখনই শুনবে তখনই এমনি চমৎকার আরামের গভীরে চলে যাবে তুমি। কিন্তু তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ তোমাকে সম্মোহিত করতে পারবে না। যতই অভিজ্ঞতা বাড়বে ততই গভীরে চলে যেতে পারবে তুমি। তোমার মধ্যে থেকে সমস্ত মানসিক চাপ দূর হয়ে গেছে, পরিপূর্ণ বিশ্রামের কোলে নিজেকে ঢেলে দিয়েছ তুমি। আরও ডুবে যাও, আরও গভীরে। প্রতিটা নিঃশ্বাসের সাথে সাথে গভীরতর স্তরে। ক্রমে আরও গভীরে চলে যাচ্ছ তুমি।

সব ধরনের সম্মোহনই আসলে আত্মসম্মোহন। এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা

বলা হয়েছে সেই সাজেশনকে মেনে নিয়ে তুমি নিজেকে নিজে সম্মোহিত করেছ। অন্যের সাজেশনে তুমি যেমন সাড়া দিয়েছ, নিজের সাজেশনেও ঠিক তেমনি ভাবেই সাড়া দেবে। নিজের উপকারের জন্যে তুমি নিজেকে যে সাজেশন দেবে সেটাই মেনে নিয়ে তাতে সাড়া দেবে তোমার অবচেতন মন।

যখন খুশি নিজেকে সম্মোহিত করবার বিদ্যা শিখছ তুমি এখন।

আত্মসম্মোহনে কোনরকম বিপদের সম্ভাবনা নেই—শুধু একটা ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকতে হবে। কোন গাড়ি বা যন্ত্র চালাতে গিয়ে যেন আত্মসম্মোহিত হয়ে না পড়ো, সেদিকে তোমার লক্ষ রাখতে হবে। নইলে বিপদ ঘটে যেতে পারে। কারণ সম্মোহিত অবস্থায় সচেতন অবস্থার মত অতটা সাবধান সপ্রতিভ থাকা অসম্ভব। তাই এখনি তোমাকে সাজেশন দিয়ে রাখছি: গাড়ি বা কোন যন্ত্র চালনার সময় ঘুমিয়ে পড়া বা সম্মোহিত হয়ে পড়া তোমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। যখন গাড়ি বা যন্ত্র চালাচ্ছ তখন শুধু যে সম্মোহিত হয়ে পড়বে না তা নয়, যতক্ষণ ওই কাজে আছ, পরিপূর্ণ সজাগ সচেতন ও সতর্ক থাকবে।

এখন যা যা করেছ প্রায় সেই সবই করতে হবে তোমাকে আত্মসম্মোহন করবার সময়। এখন যে অভিজ্ঞতা হলো, এই রকমই অভিজ্ঞতা হবে। তোমাকে সহজ একটা নিয়ম বলে দেব, সেটা মনে রাখবে, ঠিক যা যা বলছি তাই করবে···তাহলে খুব সহজেই সম্মোহিত করতে পারবে নিজেকে।

এখন যেমন আরাম করে শুয়ে বা বসে আছ, তেমনি আরামে বসবে বা শোবে। দৃষ্টিটা কোন কিছুর উপর দু'তিন মিনিট স্থির রেখে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবে তোমার সাজেশনের উপর। কতক্ষণ সম্মোহিত থাকতে চাও সে সময় নির্ধারণ করে নিয়ে তোতাপাখির মত বার বার উচ্চারণ করবে তোমার সাজেশন। চোখের পাতা দুটো ভারি হয়ে এলেই তিনবার বলবে: চোখ বুজে আসছে। চোখ বুজে যাচ্ছে। চোখ বুজে গেল। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাবে আপনিই।

জোরে কিছু বলবার হয়তো তোমার দরকার পড়বে না, নিজেকে যা বলতে চাও সেগুলো মনে মনে ভাবলেই চলবে। কিন্তু কেউ কেউ আবার মুখে উচ্চারণ করলে বেশি ভাল ফল পায়। ইচ্ছে করলে জোরে বলে দেখতে পারো ফলোন্নতি হয় কিনা। চোখ বুজে যাওয়ার পর শরীরটাকে আরও ঢিল, আরও শিথিল করে নেবে তুমি আজ যেভাবে করেছ, ঠিক

সেই ভাবে। প্রথমে পা থেকে শুরু করবে, একে একে শরীরের সমস্ত পেশী ঢিল করে দেবে। শরীরটাকে যত শিথিল করবে, ততই আরাম বোধ করবে, ততই চলে যাবে গভীরে। শরীরটা ঢিল হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে তিনবার বলবে—'শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হও'। এই কথাটা তিনবার বলার সাথে সাথেই সম্মোহিত হয়ে পড়বে তুমি। যখন নিজের ইচ্ছায় আত্মসম্মোহিত হতে যাচ্ছ, কেবল মাত্র তখনই এই কথাটা তোমাকে সম্মোহিত করবে। অন্য সময় এই কথাটার কোন প্রভাব পড়বে না তোমার উপর। 'শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হও'—কথাটা হাজার বার বললে বা শুনলেও প্রভাবিত হবে না তুমি, যদি না নিজের ইচ্ছায় আত্মসম্মোহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে কথাটা বলো।

ধীরে ধীরে তিনবার নিজেকে বলবে: 'শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হও'। কথাটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সম্মোহিত হয়ে পড়বে তুমি। এবার ডান হাতটা শূন্যে ভেসে উঠে আপনাআপনি স্পর্শ করুক তোমার মুখ। এই মর্মে সাজেশন দাও, কল্পনায় দেখো হাতটাকে ওপরে উঠে আসতে, স্পর্শ করুক মুখের কোথাও। তারপর হাতটা নামিয়ে রাখো। 'শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হও' বলবার পর ডান হাতটা উপরে উঠে তোমার মুখ স্পর্শ করা হয়ে গেলেই তলিয়ে যেতে শুরু করবে তুমি সম্মোহনের আরও গভীরে।

তোমার পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা গভীর স্তরে পৌঁছতে হলে নিজেকে বলো—'আরও গভীরে চলে যাচ্ছ তুমি'। এই কথাটা ধীরে ধীরে তিনবার বলো, সেই সাথে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাওয়ার কাল্পনিক ছবি দেখো। এবার আর সংখ্যা গণনার দরকার নেই—খুব ধীরে তিনবার নিজেকে বলো: 'আরও গভীরে চলে যাচ্ছ তুমি', সেইসাথে ধাপের পর ধাপ নেমে গভীর স্তরে চলে যাও। মনের চোখে দেখো ঘটনাটা, সিঁড়িটা দেখো, রেলিং দেখো। সিঁড়িটা কাঠের না কংক্রিটের, মোজাইক করা না সাধারণ সিমেন্ট, কয়েক ধাপ নামার পর বাঁক আছে কিনা, উপরের ল্যাণ্ডিং থেকে কি একটা বাল্‌ব্ ঝুলছে?—এইসব খুঁটিনাটি আগেই ভেবে নাও, সিঁড়িটা স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলো মনের পর্দায়। প্রত্যেকটা ধাপ নামার সাথে সাথে সম্মোহনের আরও গভীরে চলে যাবে তুমি। প্রথম দিকে অভ্যাসের সময় অন্তত বার তিনেক এই সিঁড়ি বেয়ে নামা ভাল। সেক্ষেত্রে কল্পনা করে নিতে পারো চারতলা থেকে নামছ তুমি, একেক বারে একেক তলা। প্রত্যেক তলা নামার সাথে সাথে ক্রমে গভীরতর স্তরে চলে যাবে তুমি।

বার দশেক অভ্যাসের পর একবার নামলেই যথেষ্ট হবে—একবারেই তোমার গভীরতম স্তরে পৌছে যাবে তুমি। সেখানে পৌছে একমনে পুনরাবৃত্তি করতে থাকো তোমার সাজেশনের সার-সংক্ষেপ।

মনে রাখবে, শরীরটাকে যত শিথিল করে দেবে, ততই আরাম বোধ করবে, ততই চলে যাবে গভীরে। যত গভীরে যাবে, ততই শিথিল হবে শরীর-মন, ততই আরাম বোধ করবে। মাঝে মাঝে গভীর শ্বাস নেবে, এর ফলে আরও গভীরে চলে যাবে। এখন একবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারো, এর ফলে আরও গভীরে চলে যাবে তুমি।

যখন আত্মসম্মোহিত অবস্থায় রয়েছ, তখন যদি এমন কিছু ঘটে যেজন্যে তোমার জেগে ওঠা দরকার—ফোন বাজছে, কেউ দরজার কড়া নাড়ছে, কিংবা আগুন ধরে যাওয়া বা ওই জাতীয় কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে—তৎক্ষণাৎ জেগে উঠবে তুমি। পূর্ণ সজাগ, পূর্ণ সচেতন অবস্থায় ফিরে আসবে তুমি মুহূর্তে।

কিন্তু সে-রকম কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি না হলে যখন জেগে উঠতে চাও তখন শুধু নিজেকে একবার বলবে, 'এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণলেই জেগে উঠবে তুমি'। তারপর ধীরে ধীরে এক, দুই, তিন করে পাঁচ পর্যন্ত গুণে যাও। পাঁচ বলবার সাথে সাথেই চোখ দুটো খুলে যাবে তোমার। জেগে উঠে খুব ভাল লাগবে তোমার কাছে, মনে হবে গভীর বিশ্রাম নিয়ে উঠলে। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়ে মনে হবে সজীব, প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছ।

আত্মসম্মোহনকে অনেক কাজে ব্যবহার করে উপকৃত হবে তুমি। অনেক সমস্যা সমাধানে কাজে আসবে এই বিদ্যা। তুমি যখন যে কাজের জন্যেই সাজেশন দাও না কেন, তোমার অবচেতন মন গ্রহণ করবে সে সাজেশন এবং সেইমত কাজ করবে।

সম্মোহিত অবস্থায় অনেক সময় সময়ের হিসেব রাখা যায় না, কখনও চট্ করে অনেক সময় পার হয়ে যায়। কখনও আবার খুব বেশি ক্লান্ত থাকলে সম্মোহিত অবস্থা থেকেই স্বাভাবিক ঘুমে ঢলে পড়ে কেউ কেউ। এটা বন্ধ করতে হলে প্রথমেই একটা সময় সীমা স্থির করে নেয়া উচিত। ঠিক সময় মত তোমাকে জাগিয়ে দেয়ার ভার অবচেতন মনের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারো। সময় হলেই সম্মোহনের যত গভীর স্তরেই থাকো না কেন, তোমার অবচেতন মন জাগিয়ে দেবে তোমাকে।

আত্মসম্মোহন একবার শেখা হয়ে গেলে চিরকাল রয়ে যাবে ক্ষমতাটা তোমার মধ্যে। নিয়মগুলো ভুলবে না তুমি কিছুতেই, যখনই প্রয়োজন তখনই সম্মোহিত করতে পারবে তুমি নিজেকে। তবে চর্চা একেবারে ছেড়ে না দিয়ে মাঝে মাঝে আত্মসম্মোহনের অভ্যাস রাখবে তুমি সারাজীবন। বিদ্যাটার চর্চা রাখলে শরীর-মন ভাল থাকবে তোমার।

এবার জেগে উঠবে তুমি। আমি যখন পাঁচ পর্যন্ত গুণব তখন জেগে উঠবে সম্মোহন থেকে। জেগে উঠে চমৎকার লাগবে তোমার কাছে। সজীব বোধ করবে, পরিপূর্ণ বিশ্রামের পর যে তাজা একটা খুশি খুশি ভাব হয়, সেটা অনুভব করবে তুমি। পাঁচ বলবার সাথে সাথেই সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় চোখ মেলবে তুমি। এক—সম্মোহনের গভীর থেকে উঠে আসছ তুমি। দুই—জেগে উঠছ ক্রমে। তিন—আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে সজাগ হয়ে উঠছ। চার—চোখের পাতা খুলবার আগের মুহূর্তে চলে এসেছ তুমি। এরপর পূর্ণ বিশ্রামের ভাব নিয়ে, পূর্ণ সজাগ হয়ে চোখ মেলবে তুমি। পাঁচ।

প্রয়োগ

নিজে নিজে আত্মসম্মোহন করবার আগে বেশ কয়েকবার উপরের এই রেকর্ডিংটা শোনা এবং নির্দেশ মত যেখানে যখন যা করতে বলা হয়েছে করা দরকার। তারপর নিজে প্র্যাকটিস শুরু করুন। অবশ্য যদি একবার দু'বার শুনেই স্থির নিশ্চিত হতে পারেন যে গভীর ভাবে সম্মোহিত হতে পারছেন, তাহলে শুরু করে দিতে পারেন আগেই। তবে নিজের মনে এ ব্যাপারে নিশ্চিয়তা বোধ না এলে এটা করা ঠিক হবে না।

অভ্যাস করবার জন্যে কোন ধরাবাঁধা সময় নেই—যখন খুশি, যতবার খুশি করতে পারেন। কোন রকম ক্ষতির আশঙ্কা নেই। প্রথম কিছুদিন দিনে দু'বার বা তিনবার অভ্যাস করতে পারলে ভাল হয়। বারবার টেপ-রেকর্ডার উল্লেখ করছি বলে যে আপনার একটা টেপ-রেকর্ডার সংগ্রহ করতেই হবে বা কিনতে হবে তা নয়। আর কেউ যদি কথাগুলো আপনাকে পড়ে শোনায় তাহলেও ফল একই। তবে এ-ক্ষেত্রে যিনি পড়বেন তাঁর আগে দু'তিনবার কথাগুলো পড়ে নেয়া দরকার। আর একটা কথা মনে রাখবেন—আপনি নিজে নিজে নিজেকে সম্মোহিত করছেন। যিনি পড়ছেন তিনি শুধু সাহায্য করছেন আপনাকে। কথাগুলো বেশ ধীরে ধীরে, স্পষ্ট উচ্চারণে, কণ্ঠস্বরে একটা একটানা একঘেয়ে ভাব

এনে পড়তে বলবেন তাঁকে—নাটক করবার দরকার নেই।

আত্মসম্মোহন শিখে দারুণ এক আত্মবিশ্বাস এসে যাবে আপনার মধ্যে। কিন্তু তাই বলে হাতের কাছে যাকে পাচ্ছেন তারই উপর এ বিদ্যা প্রয়োগ করতে যাবেন না দয়া করে। নিজে নিজের কোন ক্ষতি করা যায় না, কিন্তু অন্যের উপর এটা প্রয়োগ করতে হলে মনস্তত্ত্বের উপর যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার—নইলে যাকে সম্মোহন করা হচ্ছে তার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এই সম্মোহনকে আত্মসম্মোহনেই সীমাবদ্ধ রাখুন। আর কাউকে সম্মোহিত করে আপনি নিজের অজান্তেই এমন কিছু বলে বসতে পারেন যার ফলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তার। আরেকজনের মানসিক অবস্থা যখন আপনার জানা নেই, তখন কি দরকার ঝুঁকি নিয়ে? নিজের উপকারের জন্যে ব্যবহার করুন একে যত খুশি—কিন্তু স্মরণ রাখবেন, এটা খেলার জিনিস নয়, ইলেকট্রিসিটির মতই প্রচণ্ড এক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাচ্ছেন আপনি আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে। আগুন নিয়ে যেমন খুশি খেলবেন না।

শেখার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ

ধরা যাক, সবরকম উপায়ে চেষ্টা করলেন আপনি, কিন্তু আত্মসম্মোহন শিখতে পারলেন না। এরকম অবস্থায় করণীয় কি?

আসুন, পর্যালোচনা করে দেখা যাক সমস্যাটা। সেই সাথে আমরা আলোচনা করব নতুন কি উপায়ে আপনার ব্যর্থতা দূর করার ব্যবস্থা করা যায়।

সবচেয়ে আগে একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে আপনাকে। আত্মসম্মোহিত হবার জন্যে বহুবার চেষ্টা করেছেন আপনি, পদ্ধতি অনুযায়ী নিজেকে সাজেশনও দিয়েছেন, সেই সাজেশনে বলেছেন এই কথাগুলো, 'এখন আমি পরিপূর্ণ বিশ্রাম লাভ করছি···আমার শরীর এখন সম্পূর্ণ ঢিল করে দিয়েছি আমি···সম্মোহিত অবস্থা (বা মোহতন্দ্রা) থেকে জেগে উঠে আমি শান্তি, আনন্দ ও আরাম অনুভব

করব···।'—তাই না? প্রশ্নটা হলো, সত্যি সত্যিই কি আপনি শান্তি, আনন্দ বা আরাম বোধ করেছেন? টের পেয়েছেন কি শান্তি, আরাম বা আনন্দের সম্যক উপস্থিতি? যদি পেয়ে থাকেন, মনে করতে হবে, সম্মোহিত হবার যোগ্যতা তো আপনার আছেই, শুধু তাই নয়, চর্চাকালে সম্মোহিত আপনি হতেও পেরেছিলেন—তবে, এতই হালকা স্তরে গিয়ে থেমেছিলেন যে অবস্থাটা অনুভব করতে পারেননি। কিন্তু অবস্থাটা অনুভব করতে না পারার অর্থ এই নয় যে আপনার অনুভব শক্তি কম বা দুর্বল। এরকম অনেকের বেলাতেই ঘটে থাকে। আসলে, সাধারণ অর্থে জেগে থাকা অবস্থার সাথে সম্মোহিত অবস্থার পার্থক্য নির্ণয় করা বেশ কঠিন, অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্ণয় সম্ভবই হয় না।

পর-সম্মোহনের ক্ষেত্রেও এই সমস্যাটা রয়েছে। এমনই হতে বরং বেশি দেখা যায় যে সম্মোহনকারী সাবজেক্টকে সম্মোহিত করার পর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি সম্মোহিত হয়েছ কি?' সাবজেক্ট সাথে সাথে জানিয়ে দিল, 'না।' 'কেন তোমার মনে হচ্ছে তুমি সম্মোহিত হওনি?' এই প্রশ্নের উত্তরে তারা বলে থাকে, 'বাহ্। নিজের মধ্যে কোন পরিবর্তনই তো দেখছি না। আগের মতই সজাগ রয়েছি, আগের মতই সব কিছু অনুভব করছি।' অথচ মজার ব্যাপার হলো, সম্মোহিত তারা হয়েছে কিনা তা জানার টেস্টে এরা অনুকূল সাড়া ঠিকই দেয়। তার মানে, নিজেরা না জানলেও সম্মোহিত এরা হয়।

এখানে একটা কৌশলের কথা বলব আপনাকে। কিন্তু তার আগে আপনাকে কয়েকটা কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই।

সম্মোহন বা আত্মসম্মোহনের কাজ-কারবার হলো চেতন, এবং অবচেতন মনকে নিয়ে। চেতন হোক বা অবচেতন, মনকে পরিচালিত করে, অনুপ্রাণিত করে, বা অপচালিত করে একটিমাত্র জিনিস: আপনার চিন্তা বা ভাবনা।

আপনার চিন্তা-ভাবনাকে আপনি ছোট করে দেখবেন না। এটা একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী অস্ত্র, একে উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি বিস্ময়কর ফল এবং সাফল্য অর্জন করতে পারেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। বলাই বাহুল্য, সম্মোহন বা আত্মসম্মোহনের বেলায় এই কথাটা সবচেয়ে বেশি খাটে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যর্থতাকে সাফল্যে পরিণত করতে পারেন।

এবার মূল আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসা যাক।

কৌশলটা হলো: সম্মোহিত হতে ব্যর্থ এই সত্য মেনে নিয়েই, সম্মোহিত একজন সাবজেক্টের মত আপনি আচরণ করতে শুরু করবেন। অর্থাৎ, সম্মোহিত হয়েছেন এই অভিনয় বা ভান করতে হবে আপনাকে। একের পর এক টেস্টের অনুশীলন করবেন আপনি, এবং যেভাবে একজন সম্মোহিত সাবজেক্ট সাড়া দেয় ঠিক সেইভাবে সাড়া দেবেন প্রতিটি ক্ষেত্রে। রোল প্লে বা ভূমিকা প্রতিপালন হচ্ছে এই কৌশলটার ভিত্তি।

উপরিউক্ত নির্দেশ মেনে আপনি আচরণ করলে সম্মোহনের জন্যে একান্তভাবে প্রয়োজন যে জিনিসটার অর্থাৎ অবচেতন মনকে শর্ত দিয়ে মজবুত করে বাঁধার যে প্রয়োজনীয়তা তা পূরণ করার পথ উন্মুক্ত হবে।

ভূমিকা প্রতিপালকের কৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ব্যবহার করে অনেকে ভাল ফল পেয়েছেন, আশা করি আপনিও পাবেন।

একটা কথা বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করতে চাই আমি আবার। কথাটা হলো, মনে রাখবেন, আত্মসম্মোহনে চোখ বন্ধ করতে সফল হলে অর্থাৎ আই ক্লোজার টেস্টে সাফল্য লাভ করলে আপনি নিজেকে নিরাময় সংক্রান্ত পোস্ট-হিপনোটিক সাজেশন দিতে পারেন। আপনার মানসিক সমস্যা, ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদির সমাধান বা উপশমের জন্যে চোখ বন্ধ করতে পারার স্তরই যথেষ্ট। এই স্তরে আরও একটা বিশেষ সাজেশন দিতে হবে নিজেকে আপনার। পরবর্তী সময়ে আবার যখন আত্মসম্মোহনের চর্চা করবেন তখন যেন নির্দিষ্ট সংখ্যা গোণার সাথে সাথে আরও গভীর স্তরে প্রবেশ করতে পারেন তার অনুকূলে প্রয়োজনীয় সাজেশন তৈরি করে উচ্চারণ করবেন।

আপনি আত্মসম্মোহন শিখতে সফল হবেনই এই বিশ্বাসটা গভীরভাবে গেঁথে নিন মনে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেমন, আত্মসম্মোহনও তেমনি বিশ্বাসের ব্যাপার। বিশ্বাস করলে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। বিশ্বাস করলে তেমনি আত্মসম্মোহন শিখে এর দ্বারা প্রভূত উপকার পাওয়া যায়।

সাজেশন গ্রহণ করতে পারার যোগ্যতা সম্পর্কেও অনেকে অহেতুক দ্বন্দ্বে বা সন্দেহে ভুগে থাকেন। সন্দেহটার কোন ভিত্তি নেই, সুতরাং এ ব্যাপারে আপনারও সাবধান থাকা উচিত। আপনি যদি মনে করেন আপনার মানসিক গঠন সাজেশন গ্রহণ করার উপযুক্ত নয় তাহলে ভুল করবেন।

আসলে, সম্মোহনে বা আত্মসম্মোহনে আপনার সাড়া দিতে না পারার ব্যর্থতাটাই প্রমাণ করে আপনার সাজেসটিবিলিটি। সাড়া দিতে পারছেন না, তার কারণ সম্মোহনের প্রতি কোন নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে অর্থাৎ আপনি প্রভাবিত হচ্ছেন প্রতিকূল দিক থেকে। নেগেটিভ বা নেতিবাচক সাজেশনের দ্বারা আপনি প্রভাবিত। এ থেকেই প্রমাণ হয় সাজেশন গ্রহণ করার মত মানসিক গঠন আপনার আছে।

নিচের শব্দগুলো লক্ষ করুন।

বাংলাদেশ, ফুটবল, শেরে বাংলা ফজলুল হক, মুক্তিযুদ্ধ, কলেরা, হাইজ্যাক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, নদী, চোর, সমাজতন্ত্র, হা-ডু-ডু, বাবা, মা, মাও সে তুং, ইংল্যাণ্ড, ইসরায়েল, পাকিস্তান—এই রকম হাজার হাজার শব্দ আছে যার একটি পড়া বা শোনা মাত্র আপনার মনে সংশ্লিষ্ট বিষয়, দেশ বা ব্যক্তি সম্পর্কে স্বয়ংক্রিয় ভাবে নির্দিষ্ট একটা ভাবের সৃষ্টি হয়, একটা ধারণা জন্মলাভ করে। পাকিস্তান শব্দটির কথা ধরুন, শোনা বা পড়া মাত্র আপনার মনে পাকিস্তান সম্পর্কে একটা ধারণা জেগে উঠবে না? উঠবেই। কেন ওঠে? কারণ হলো, আপনার অবচেতন মন একটি কমপিউটারের মত যন্ত্রবিশেষ, পাকিস্তান সম্পর্কে সে আগে থেকেই তথ্য ইত্যাদি জমা করে রেখেছে। শব্দটা যতবার পড়বেন বা শুনবেন ততবারই সে আপনাকে পাকিস্তান সম্পর্কে একটা তথ্য ভিত্তিক ধারণা সরবরাহ করে যাবে। অন্য যেকোন শব্দের বেলায়ও ব্যাপারটা তাই। একজন শত্রুর কথা ধরুন, যাকে আপনি ভয় করেন। তার নাম শোনামাত্র আপনার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটবে। কারণ কি? কারণ, লোকটির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা আছে এ তথ্য আপনার অবচেতন মন টুকে রেখেছে। আপনার পরম বন্ধু বা শুভানুধ্যায়ী একজনের কথা মনে পড়ে যাক, দেখবেন তখুনি, বিচার বিবেচনার জন্যে কোনরকম সময় না দিয়েই, তার প্রতি স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধা মিশ্রিত অনুকূল অনুভূতিতে ছেয়ে যাবে আপনার মন। আপনার অবচেতন মনে বন্ধুটি সম্পর্কে তথ্য জমা আছে, সে (অবচেতন মন) জানিয়ে দিচ্ছে আপনাকে, যার কথা মনে করছ সে তোমার উপকারী বন্ধু বা শুভানুধ্যায়ী।

প্রমাণ হলো, শব্দের দ্বারা আপনি প্রভাবিত হন। তিন রকমভাবে প্রভাবিত হতে পারেন আপনি। অনুকূল ভাবে, প্রতিকূল ভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে। এখন, আপনি যদি আত্মসম্মোহনের ক্ষেত্রে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হতে থাকেন, ফলাফল কি দাঁড়াবে? ফলাফল

দাঁড়াবে, আত্মসম্মোহন শিখতে চাইবেন না আপনি, এর প্রতি আপনার আস্থা থাকবে না, বিশ্বাস করবেন না যে চেষ্টা করলেই আত্মসম্মোহন শেখা যায়। যদি শখ বা কৌতূহল মেটাবার জন্যে শিখতে চেষ্টা করেন, শিখতে পারবেন না সহজে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই শেখা সম্ভব হবে না আপনার দ্বারা—যতক্ষণ না প্রতিকূল মনোভাবটিকে ত্যাগ করে অনুকূল মনোভাব গড়ে নেন নিজের মধ্যে।

শেষ বাক্যটির শেষ চারটে শব্দের দ্বারা আমি বোঝাতে চাইছি, আপনি ইচ্ছে করলে নিজেকে অনুকূলভাবে প্রভাবিত করতে পারেন, সে ক্ষমতা আপনার-আমার সকলের মধ্যেই রয়েছে।

এমন হতে পারে আত্মসম্মোহনের প্রতি আপনি নিজের অজ্ঞাতেই প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত। এ রকম হয়। সেক্ষেত্রে, এর চিকিৎসা হলো, সজ্ঞানে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে আত্মসম্মোহনের প্রতি অনুকূলভাবে প্রভাবিত হবার জন্যে। তা কিভাবে সম্ভব?

সম্ভব আত্মসম্মোহন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে। আত্মসম্মোহন আসলে কি, এর দ্বারা আপনি কি কি উপকার পেতে পারেন ইত্যাদি জানুন এবং শুধু জানলেই চলবে না, প্রথমে বিশ্বাস আনতে হবে এর উপকার করবার ক্ষমতার উপর, তারপর শেখার জন্যে চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টা করতে গিয়ে কয়েকবার বা কয়েক মাস ব্যাপী ব্যর্থতার সম্মুখীন হলেও হাল ছেড়ে না দিয়ে নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জনের চেষ্টা চালাতে হবে। তবেই আসতে পারে সাফল্য।

আত্মসম্মোহনের বাস্তব প্রয়োগ

সম্মোহনের দ্বারা সবচেয়ে বড় উপকার যেটা পাওয়া যায় সেটা হলো, পরিপূর্ণ বিশ্রাম লাভ।

আধুনিক সভ্যতা এমন এক স্থানে নিয়ে এসেছে আমাদেরকে যেখানে প্রতিদিন আমরা দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা এবং উদ্বেগের মুখোমুখি হতে বাধ্য হচ্ছি। সুতরাং সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা দরকার আমাদের তা হলো এই পরিপূর্ণ বিশ্রাম লাভের সুযোগ। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়

এ সুযোগ পাওয়া অন্য কোন উপায়ে সহজ নয়। একমাত্র সম্মোহনই আমাদের জন্যে পরিপূর্ণ বিশ্রাম লাভের সহজ সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে।

পরিপূর্ণ বিশ্রাম লাভের জন্যে নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন এই বইয়ের প্রথম দিকে বিশদভাবে উল্লেখ করেছি, এই পরিচ্ছেদে এ-প্রসঙ্গে নতুন করে আর কিছু না বললেও চলবে। আসুন, অন্যান্য ক্ষেত্রে আত্মসম্মোহনের প্রয়োগ কিভাবে করবেন তা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

লাঙ ক্যান্সার

লাঙ ক্যান্সার বহু লোকের কাছে প্রকাণ্ড একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধূমপান লাঙ ক্যান্সারের অন্যতম কারণ। ধূমপান ছাড়তে পারলে লাঙ ক্যান্সারের ভীতি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু ছাড়তে চাইলেই সবাই আমরা সিগারেট খাওয়া ছাড়তে পারি না। আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে চাইলে সিগারেট খাওয়া আপনি নিশ্চিত ভাবে ত্যাগ করতে পারবেন।

সিগারেট ছাড়ার সবচেয়ে ভাল উপায় হলো সিগারেট খাওয়াটাকে অসম্ভব করে তোলা। কিভাবে তা সম্ভব?

এমন অনেক খাদ্যদ্রব্য এবং ওষুধ আছে যার উগ্র ঝাঁঝের জন্যে বা গন্ধের জন্যে সেটা আমরা সহ্য করতে পারি না। সেই ওষুধ বা খাবারের কথা মনে পড়লেই আমরা বিচলিত বোধ করি, ভয় হয়, এখুনি বুঝি আবার সেই গন্ধ বা স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। সেই ওষুধ বা খাবারের প্রতি আমাদের মধ্যে বিরূপ ধারণা আছে, আছে ঘৃণা বা ভয়। এই বিরূপ ধারণা, ঘৃণা বা ভয়কে আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে ধূমপান ত্যাগ করার জন্যে কাজে লাগাতে পারা যায়।

ধরুন, সিগারেট খাওয়াটা ছাড়তে চান আপনি। ছাড়তে চান লাঙ ক্যান্সার হবার ভয়ে। কি করতে হবে আপনাকে?

আত্মসম্মোহন চর্চাকালে কিভাবে নিজেকে সাজেশন দিতে হয় জানা আছে আপনার। সেই ভাবে নিজেকে সাজেশন দিন, 'আমি সিগারেট খেতে পারব না, কারণ সিগারেটের মধ্যে এমন একটা গন্ধ তীব্রভাবে আছে বা আমাকে মনে করিয়ে দেয়, "—" এর কথা।' এখানে শূন্য জায়গাটা আপনি পূরণ করবেন যে ওষুধ বা খাবারটা গন্ধ বা স্বাদ আপনার মধ্যে ঘৃণা, ভয় বা বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করে সেই ওষুধ বা খাবারের নামটা

দিয়ে। একবার নয়, একদিন নয়, যখনই আপনি আত্মসম্মোহন চর্চা করবেন অর্থাৎ প্রত্যেক অধিবেশনে বার বার, অসংখ্যবার এই ধরনের স্বরচিত সাজেশন আওড়াবেন। সেই সাথে মানসচক্ষে চাক্ষুষ করবেন, আপনি সিগারেট ধরিয়ে টান দিচ্ছেন কিন্তু ঘৃণার ভাব সঞ্চার করে যে খাবার বা ওষুধ তার গন্ধ সিগারেটের মধ্যে পাচ্ছেন বলে দু'বার বা তিনবারের বেশি ধোঁয়া টানতে পারছেন না।

পদ্ধতিটা খুবই সহজ বলে মনে হয়। সহজই। কিন্তু এই সহজ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই হাজার হাজার ধূমপায়ী ধূমপান ত্যাগ করতে পেরেছেন। আমার লেখা 'ধূমপান ত্যাগে আত্মসম্মোহন' বইটিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

মদ্যপান ত্যাগ

ধূমপান ত্যাগ করার যে প্রক্রিয়া তা মদ্যপান ত্যাগ করার জন্যে প্রযোজ্য নয়, এর জন্যে আলাদা প্রক্রিয়ার দরকার। ধূমপান একটা সাইকোলজিক্যাল অ্যাডিকশন, ছেড়ে দিলে যে শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয় তা তেমন মারাত্মক বা জোরাল নয়। কিন্তু মদ্যপানের ব্যাপারটা অন্যরকম। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান ফিজিক্যাল অ্যাডিকশন। সেজন্যে ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথেই নানারকম শারীরিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে মদ ছাড়ার উপায় কি?

মদ খেলে দুঃখ ভোলা যায়, এটা একটা ভুল ধারণা। এই রকম আরও অনেক ভুল ধারণার ফলে মদের প্রতি আসক্তি জন্মে যায় মানুষের। ভুল এবং মিথ্যে ধারণার জায়গায় মদ্যপ লোকের মনে ঢুকিয়ে দিতে হবে প্রকৃত এবং বাস্তব ধারণা। সে আত্মসম্মোহন চর্চাকালে নিজেকে সাজেশন দিয়ে বলবে, 'মদ খাওয়া ছেড়ে দিলে দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্যার উদ্ভব হবে সহজেই সেগুলোর মোকাবিলা করতে সমর্থ হব আমি।' আমরা সবাই জানি, বিপদ বা সমস্যাকে আমরা যত বড় বলেই মনে করি না কেন, একবার তার মুখোমুখি হতে পারলে সেটা তখন আর অত বড় থাকে না।

আশ্চর্য শোনালেও, মদ্যপান করার প্রবণতা আসলে আত্মসম্মোহনেরই একটা ধরন থেকে সৃষ্ট। তাই এর চিকিৎসাও আত্মসম্মোহনের দ্বারা সহজে সম্ভব। মদ খেয়ে মানুষ মাতাল হয় কেন? একটি, একাধিক বা অসংখ্য ভুল ধারণার ফলে মূল্যবোধের অবনতি ঘটে,

তারই ফলাফল এটা। ভুল ধারণাগুলো সরাতে হলে তার জায়গায় সঠিক ধারণা মনের ভিতর রোপণ করতে হবে। সত্যিকার ব্যক্তিত্ব কাকে বলে, কারও দেখাদেখি কিছু করা সর্বক্ষেত্রে কেন উচিত নয়, রুচিশীল হওয়া কেন গুরুত্বপূর্ণ—এসব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হবে তাকে। মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটানো আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে খুব সহজেই সম্ভব, যে-কেউ চর্চা করলেই এই লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে।

বদভ্যাস ত্যাগ

এক বা দু'দিনের না-কামানো দাড়ি দু'আঙুলের নখ দিয়ে ধরে হেঁচকা টান মেরে উপড়ে ফেলা, যখন তখন যার তার সামনে জিভ বের করে ঠোঁট চাটা, অকারণে কাঁধ বাঁকানো, পা নাচানো, দাঁত দিয়ে হাতের নখ কামড়ানো—এই ধরনের অসংখ্য বদ অভ্যাস থাকে অনেকের। এগুলো সবই ক্ষেত্র বিশেষে অশোভন। আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে ধূমপান ছাড়ার জন্যে যে প্রক্রিয়া প্রযোজ্য , এই বদভ্যাসগুলো ত্যাগ করতে চাইলে ওই একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন, সুফল পাবেন।

মেদ কমানো

ওজন বেড়ে যাওয়া আর একটা কঠিন সমস্যা বা রোগ। আমাদের দেশে এটা খুব একটা ব্যাপক সমস্যা না হলেও, ওজন কমানো উচিত বলে মনে করেন এমন লোকের সংখ্যা নেহায়েত কমও নয়।

স্বাভাবিকের চেয়ে ওজন যদি আপনার বেশি হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেজন্যে দায়ী আপনার শরীরের গ্ল্যাণ্ডগুলো নয়। সহজ সরল সত্য হচ্ছে এই যে আপনি খাওয়াদাওয়াটা করেন একটু বেশি পরিমাণে।

কারও কারও বেলায় অতিভোজন একটা মানসিক সমস্যা। অবহেলা এবং অনিশ্চয়তায় মানুষ যারা তারা অতিভোজনের শিকার হয়ে পড়তে পারে। ভালবাসা, স্নেহ, সহানুভূতির কাঙাল যারা তারা এসবের অভাব পূরণ করতে চেষ্টা করে যত বেশি সম্ভব পেট ভর্তি করে খেয়ে নিয়ে।

খিদে কমাবার ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু আত্মসম্মোহন যে শিখেছে তার জন্যে, অর্থাৎ আপনার জন্যে, এ ধরনের ওষুধের কোনই প্রয়োজন নেই। মানসচক্ষে নিজেকে চলাফেরা করতে দেখবেন চমৎকার

ফিগারে। ঠিক যেমন হতে চান আপনি মেদ ঝরিয়ে দিয়ে, তেমনি শারীরিক গঠনের অধিকারী হিসেবে চাক্ষুষ করুন নিজেকে আপনি। নিজের এই কাল্পনিক স্লিম চেহারাটা সব সময় মনে ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে আপনার, এবং সেই সাথে নির্দিষ্ট চর্বি-জাতীয় খাদ্য সম্পর্কে প্রতিকূল সাজেশন দিতে হবে আত্মসম্মোহন চর্চা করার সময়। সিগারেট ছাড়ার প্রক্রিয়াটা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কিন্তু সবাই মানসিক কারণে অতিভোজনে অভ্যস্ত হয় না। এমন অনেক লোক রয়েছে যারা এসেছে নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন পরিবার থেকে, যে পরিবারে 'বাসন চেটে পরিষ্কার' করাটা ছিল আইন। খাদ্যদ্রব্যের তীব্র অভাবই এর কারণ। আবার এমন বিত্তবান পরিবার থেকে এসেছে কিছু লোক যারা তাদের মা-বাবার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে অতিভোজনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

সমস্যা উদ্ভব যেখানেই হোক, যে কারণেই হোক, সমাধান নিহিত রয়েছে আত্মসম্মোহনের মধ্যে। যে-কেউ এর মাধ্যমে তার ওজন কমাতে পারে।

ব্যথা দূর করতে আত্মসম্মোহনের ভূমিকা

সন্তান প্রসবের, দাঁত তোলার, ক্যান্সারের এবং আরও নানা ধরনের রোগের দরুন যে প্রচণ্ড, অসহ্য, অদম্য ব্যথা-বেদনা ও যন্ত্রণা হয় তার উপশম ঘটানো আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে সম্ভব। সব ধরনের ব্যথা ওষুধে সারে না, বা সারাবার নিয়ম নেই; যেমন, গর্ভযন্ত্রণার কথা ধরুন। আবার এমন কিছু ব্যথা আছে যা ওষুধের ক্রিয়া খানিকপর শেষ হয়ে গেলে আবার দেখা দেয়, অসহ্য হয়ে ওঠে। ওষুধের আর এক অসুবিধে, উপর্যুপরি প্রয়োগ এর কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এমন এক সময় আসে যখন আরও বেশি মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ করেও ফল পাওয়া যায় না, ব্যথা কমে না পুরোপুরি, বা স্থায়ীভাবে। একমাত্র আত্মসম্মোহনই কার্যকরভাবে এই ধরনের যন্ত্রণা ও ব্যথা-বেদনাকে দমন করতে পারে।

যন্ত্রণায় ভুগছে এমন লোককে সাধারণত পর-সম্মোহনের দ্বারা আরাম দেবার চেষ্টা করা হয়, তারপর যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে তাকে আত্মসম্মোহন শেখানো হয়। এখন তো হাজার হাজার মায়েরা আত্মসম্মোহন চর্চার মাধ্যমে গর্ভযন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় জেনে

নিয়েছেন। হাসিমুখে সন্তান প্রসব করছেন তাঁরা, ব্যথার ভয়ে তাঁরা এখন আর আতঙ্কিত নন।

সন্তান প্রসবকালীন যন্ত্রণা বন্ধ করার জন্যে যে প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে সেই প্রক্রিয়াই অন্যান্য ব্যথা-বেদনা বন্ধ করার জন্যে প্রযোজ্য। প্রক্রিয়াটা শিখে রাখা দরকার সকলেরই, যাতে প্রয়োজনে অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োগ করে প্রচণ্ড ব্যথা বেদনা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রক্রিয়াটি হলো:

সম্মোহিত করবেন আপনি নিজেকে । বিছানায লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন প্রথমে। ঢিল করে দিতে হবে শরীর, গ্রহণ করতে হবে পরিপূর্ণ বিশ্রাম—এসব আপনার জানা আছে। প্রথম দফায় অর্থাৎ প্রস্তুতির জন্যে দেয়া প্রক্রিয়াগুলো অনুশীলন করুন। ইচ্ছে করলে এই বইয়ে দেয়া সবগুলো প্রক্রিয়া অনুশীলন করতে পারেন।

এরপর নিজেকে আপনি সাজেশন দেবেন, আপনার ডান হাতটা ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। হাতটাকে উঠে যেতে দিন। আপনি নিজের চেষ্টায় তুলবেন না, আপনাআপনি উঠে যেতে দিন। হাতটা যখনই মাথার উপর উঠে যাবে, সাজেশন পরিবর্তন করে নিজেকে আপনি বলবেন, মাথার উপর খাড়া হয়ে থাকা ডানহাতটা ভারি এবং অবশ হয়ে আসছে, ক্রমেই লোহার রডের মত শক্ত হয়ে আসছে। খানিকক্ষণ এই ধরনের সাজেশন দিলেই দেখবেন, সত্যি সত্যি সম্পূর্ণ হাতটা শক্ত ভারি এবং অসাড় হয়ে গেছে। কেউ ধরে প্রচণ্ড জোরে মুচড়ে দিলেও ব্যথা পাবেন না আপনি ওই হাতে। এইবার হাতটা নামিয়ে আনার জন্যে প্রয়োজনীয় সাজেশন দেবেন আপনি। হাতটা নামিয়ে এনে ঠেকাতে হবে আপনার শরীরের যেখানে প্রচণ্ড ব্যথা বা যন্ত্রণা হচ্ছে সেখানে। এক সময় আপনি অনুভব করবেন, ব্যথার জায়গাটাও, ডান হাতটার মত অবশ হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি অবশ, অসাড় হয়ে যাবে, এতটুকু ব্যথা আপনি আর অনুভব করবেন না।

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সবরকম ব্যথা-বেদনা, তা যতই প্রচণ্ডই হোক না কেন, বন্ধ করা সম্ভব। হাজার হাজার মানুষ অনুশীলন করছে প্রক্রিয়াটা, মুক্তি পাচ্ছে তারা অসহ্য যন্ত্রণার কবল থেকে।

আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে সরাসরি সাজেশন দিয়েও যন্ত্রণা বন্ধ করা যায়। কিন্তু তা করতে হলে আপনাকে পৌঁছুতে হবে অত্যন্ত গভীর somnambulistic স্তরে।

এক ঘন্টা থেকে ঊনষাট মিনিট বাঁচানো

গভীর, তীক্ষ্ণ মনোযোগ এবং শেখার ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে আত্মসম্মোহনের সাহায্য নিয়ে আশাতীত লাভবান হতে পারেন আপনি। চিকিৎসার প্রয়োজনে প্রয়োগের চেয়ে এই ক্ষমতা বাড়াবার প্রয়োজনে আত্মসম্মোহনের প্রয়োগ অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। কারণ, সম্মোহিত অবস্থায় যে-কেউ যে-কোন বিষয়ে দ্রুত জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

সময় সঙ্কুচিত এবং পরিবর্তিত হয়, এ আপনিও দৈনন্দিন জীবনে টের পান। স্মরণ করে দেখুন, আপনি যখন পছন্দ নয় বা করতে আগ্রহ নেই এমন কোন কাজ করতে বাধ্য হন তখন সময় কেমন দীর্ঘ হয়ে ওঠে, যেন কাটতেই চায় না; অথচ পছন্দসই, করতে মজা লাগে এমন কোন কাজ করার ক্ষেত্রে সময় কত তাড়াতাড়ি বয়ে যায়। কিভাবে সম্ভব হয় এটা?

সচেতন মন সময়কে টুকে রাখে ফিজিক্যালি, ঘড়ির কাঁটা দেখে। কিন্তু অবচেতন মন সময় সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলাদা ধারণা পোষণ করে।

সচেতন মন সময় সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে আমরা সেটাকেই ব্যবহার করি, তাই এটা অবজেকটিভ। এই অবজেকটিভিটি আমাদের জানাচ্ছে, চিন্তা এবং গতির জন্যে নির্দিষ্ট সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা এবং দিন প্রয়োজন হয়।

সময় সম্পর্কে অবচেতন মনের ধারণার সাথে সচরাচর পরিচয় ঘটে না আমাদের, সেজন্যে একে ব্যবহার করারও তেমন সুযোগ নেই।

আপনার ব্যক্তিগত সময় দীর্ঘ না সংক্ষিপ্ত তা নির্ভর করে আপনি কোন্ পরিস্থিতিতে অবস্থান করছেন তার উপর। আপনি যখন সুখী বা খুশি, সময় তখন দ্রুত বয়ে যায়। কিন্তু যখনই আপনি বিষণ্ণ বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সময় কাটতেই চায় না।

সময় আসলে বহুরূপী। এর প্রায় সবগুলো রূপের সাথে আমরাও কমবেশি পরিচিত। কখনও যদি ভয়ঙ্কর ধরনের বিপদের মুখোমুখি হন তাহলে আপনার চারদিকের সবকিছু ধীর, মন্থর গতি লাভ করে, সময়কে মনে হয় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যতক্ষণ না বিপদটা কেটে যায়। বিপদ কেটে গেলে অবজেকটিভ সময় আবার যাত্রা শুরু করে এবং সব কিছু স্বাভাবিক গতি ফিরে পায়।

সম্মোহিত অবস্থায় পড়াশোনা করুন, বিভিন্নভাবে লাভবান হবেন। অল্প সময়ে অনেক বেশি তো শিখবেনই, যা শিখবেন তা ভুলে যাবার সম্ভাবনাও অপেক্ষাকৃত কম। যে পড়াটা মুখস্থ করতে আপনার সাধারণত এক ঘণ্টা লাগবার কথা সেই পড়াটা আপনি আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে অনেক কম সময়ে মুখস্থ করে ফেলতে পারবেন। সম্মোহিত অবস্থায় পড়াশোনা করার আর একটি সুবিধে হচ্ছে, শুধু পাঠ্য বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করছেন আপনি, অন্য কোন দিকে খেয়াল দিয়ে সময় নষ্ট করছেন না।

অভিনয় শেখা

অভিনয় শিক্ষার জন্যে বিদেশে আত্মসম্মোহনের সাহায্য নিচ্ছে বহু লোক। ইউরোপ এবং আমেরিকার শত শত প্রতিষ্ঠিত প্রফেশনাল ও সৌখিন অভিনেতা-অভিনেত্রী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, তাঁরা আত্মসম্মোহনের কাছে ঋণী।

খেলার মান বাড়াতে

খেলোয়াড়রাও আত্মসম্মোহনের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারেন, বাড়াতে পারেন তাঁদের খেলার মান। গবেষণার ফলে জানা গেছে খেলার মান বাড়াতে হলে খেলোয়াড়ের মানসিক গুণ ও ক্ষমতাগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। তা লাগাতে হলে আত্মসম্মোহন শিখে নিজেকে সম্মোহিত করতে হবে তার, তারপর প্রয়োজনীয় গুণ ও ক্ষমতার বিকাশ ঘটাবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সাজেশন দিতে হবে।

একান্ত ব্যক্তিগত লাভ

আত্মসম্মোহনকে আপনি এক হাজার একটি কাজে ব্যবহার করতে পারেন। আপনার মানসিক সমস্যার সমাধান আপনি নিজেই যদি করতে চান, পরম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করুন আত্মসম্মোহনকে। আত্মসম্মোহন আপনাকে শান্তির পথ দেখাবে, সুখী হতে সাহায্য করবে. ভুলিয়ে দেবে ব্যথা-বেদনা, তিক্ত-স্মৃতি, অনেকদিন থেকে পুষে রাখা মনের ক্ষোভ.

দমন করতে পারবেন প্রচণ্ড রাগ, ছাড়তে পারবেন ক্ষতিকর বদভ্যাস, আত্মসম্মোহন আপনাকে উচ্চাভিলাষী হতে প্রেরণা যোগাবে, জ্ঞান আহরণে সাহায্য করবে, সুখী হবার পথ নির্দেশ করবে এবং আপনাকে সম্ভাব্য যে-কোন বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে আগে থেকে সতর্ক করে দেবে।

উপসংহারে বলতে চাই, আত্মসম্মোহন বিদ্যাটি আপনার এমন এক বন্ধু, যার মাধ্যমে আপনার ভেতরের প্রচণ্ড শক্তিশালী অবচেতন মনের কাছ থেকে যে-কোন বিষয়ে যে-কোন সাহায্য চেয়ে আপনি বিমুখ হবেন না। শর্ত একটাই, চাইতে হবে চাওয়ার মত করে, সঠিক নিয়মে, কায়মনোবাক্যে। তাহলেই হবে।